প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

- এক নজরে আত্ম উন্নয়নের প্রক্রিয়া
  মোহাম্মাদ আলী সোমালী
- কোরআনের আলোকে মহান আল্লাহর আরশে সমাসীন হওয়া
- নবুওয়াত
- ইসলাম ও বহুমাত্রিকতা
  আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার
- ইসলাম ও আধুনিকতা : একটি পর্যালোচনা
  সংকলন : আব্দুল কুদ্দুস বাদশা
- ওয়াহাবি মতবাদের স্বরূপ
  মোহাম্মাদ রেজওয়ান হোসাইন
- মুসলিম উম্মাহর সমস্যা : কারণ ও সমাধান
  নূর হোসেন মজিদী
- মানবতাবাদী চিন্তাধারার সমালোচনা
  আবু যাহরা
- আপনার জিজ্ঞাস

বর্ষ ৪, সংখ্যা ৩-৪, অক্টোবর ২০১৩ - মার্চ ২০১৪

بسم الله الرحمان الرحيم

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু

আল্লাহ্‌র নামে

প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ৪, সংখ্যা ৩-৪

অক্টোবর ২০১৩ - মার্চ ২০১৪

সম্পাদক : **এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর**

সহযোগী সম্পাদক : **ড. জহির উদ্দিন মাহমুদ**

নির্বাহী সম্পাদক : **মো. আশিফুর রহমান**

উপদেষ্টামণ্ডলী : মোহাম্মদ মুনীর হুসাইন খান

আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

এস.এম. আশেক ইয়ামিন

প্রকাশক : মো. আশিকুর রহমান

প্রকাশকাল : আশ্বিন-চৈত্র ১৪২০

জিলহজ ১৪৩৪- জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৫

মূল্য : ১০০ (একশ) টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা : দোকান নং ৩৩৬ (৩য় তলা, দক্ষিণ পার্শ্ব), মুক্তবাংলা

(পরিবর্তিত ঠিকানা) শপিং কমপ্লেক্স, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

Prottyasha (Vol. 4, No. 3-4, October 2013 - March 2014), Editor: A.K.M. Anwarul Kabir; Associate Editor: Dr. Zahiruddin Mahmud; Executive Editor: Md. Asifur Rahman; Advisors: Mohammad Munir Hossain Khan, Mohammad Abdul Quddus Badsha, S.M. Asheque Yamin; Publisher: Md. Ashiqur Rahman; Address: 336 (2nd fl. Right Side), Muktobangla Shopping Complex, Mirpur-1, Dhaka-1216.

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়**

  ইসলাম মানবতার ধর্ম ৭

- **নীতি-বিজ্ঞান**

  এক নজরে আত্ম উন্নয়নের প্রক্রিয়া ১১

  মোহাম্মাদ আলী সোমালী

- **ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন**

  কোরআনের আলোকে আল্লাহর আরশে সমাসীন হওয়া ৩১

  নবুওয়াত ৪৫

  ইসলাম ও বহুমাত্রিকতা ৫৭

  আসগার আলী ইঞ্জিনিয়ার

  ইসলাম ও আধুনিকতা : একটি পর্যালোচনা ৬৫

  সংকলন : আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

  ওয়াহাবি মতবাদের স্বরূপ ৮৭

  মোহাম্মাদ রেজওয়ান হোসাইন

- **বিশেষ নিবন্ধ**

  মুসলিম উম্মাহর সমস্যা : কারণ ও সমাধান ১০৯

  নূর হোসেন মজিদী

- **দর্শন**

  মানবতাবাদী চিন্তাধারার সমালোচনা ১৩১

  আবু যাহরা

- **আপনার জিজ্ঞাসা** ১৩৯

Prottyasha

A Quarterly Journal of Human Development
Vol. 4, No. 3-4, October 2013- March 2014

Table of Contents

- **Editorial**
  Islam: Religion of Humanity **7**
- **Ethics**
  A Glance at the Process of Self-development **11**
  Dr. Mohammad Ali Shomali
- **Theology**
  Arsh-Allah- In the View of Holy Quran **31**
  Prophet Hood **45**
  Islam and Religious Pluralism **57**
  Asghar Ali Engineer
  Islam and Modernism: A Preview **65**
  Compilation: Abdul Quddus Badsha
  Characteristics of Wahabism **87**
  Mohammad Rezwan Hossain
- **Special Article**
  Problems of Muslim: Cause and Solution **109**
  Nur Hossain Mazidi
- **Philosophy**
  Criticism of Humanism **131**
  Abu Zahra
- **Your Questions** **139**

গ্রাহক চাঁদার হার		
ডাকযোগে (পোস্টাল চার্জ সহ)	৬০ টাকা (প্রতি কপি)	২৪০ টাকা (বাৎসরিক)

ডাকযোগে পত্রিকা পেতে গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার করে নিচের ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে :

মো. আশিফুর রহমান
বাড়ি নং-৪ (পশ্চিম পাশ, নিচতলা), রোড নং-৩, ব্লক- সি, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

সম্পাদকীয়

ইসলাম মানবতার ধর্ম

৬

ইসলাম মানবতার ধর্ম

ইসলাম পরম করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষ (সূরা আহযাব : ৪০) ও পরিপূর্ণ এক ধর্ম (সূরা মায়িদা : ৩)– যা সমগ্র মানবজাতির মুক্তির বাণী নিয়ে এসেছে (আ'রাফ : ১৫৭-১৫৮)। এ ধর্মের মধ্যে মহান স্রষ্টার করুণার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। একারণে এ ধর্মের নবীকে আল্লাহ বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ বলেছেন (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)। যেহেতু রাসূল (সা.) কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের প্রতি নবী, সেহেতু তাঁর আনীত শরীয়তের মধ্যে তাঁর অনুসারীদের জন্য বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর প্রতি করণীয় নির্ধারিত হয়েছে। পৃথিবীর মানুষরা ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্বাসগতভাবে মূলত তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা: মুমিন, আহলে কিতাব ও মুশরিক। পবিত্র কুরআন এ তিন শ্রেণির প্রতি মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইসলাম এক আল্লাহ ও এক নবীতে বিশ্বাসীদের যেমন বিশেষ অর্থে পরস্পরের ভাই বলে অভিহিত করেছে (হুজুরাত : ১০) তেমনি বিশ্বের সকল মানুষকে হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান হিসাবে (সূরা নিসা : ১) সাধারণ অর্থে পরস্পরের ভাই বলে গণ্য করেছে। আবার মুসলমান, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের একত্ববাদী হিসাবে একই দলের অন্তর্ভুক্ত বলেছে (আলে ইমরান : ৬৪)।

মানবজাতির প্রতিটি সদস্য, যে বিশ্বাসীরেই অধিকারী হোক, সত্তাগতভাবে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান লাভ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন : নিশ্চয় আমরা আদমের সন্তানদের সম্মানিত করেছি (সূরা বনি ইসরাঈল : ৭০)। সত্তাগত এ সম্মানের দাবি হলো তাদের সাথে ন্যায়পরায়ণতার সাথে আচরণ করা হবে। ইসলাম মুসলমানদের সর্বজনীন কিছু দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছে, যেমন ন্যায়বিচার, সদাচরণ, প্রতিশ্রুতি রক্ষা... (সূরা নাহল : ৯০)। বিশ্বের অধিবাসীদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে মুসলমানদের এ মৌলননীতিগুলো মেনে চলা অপরিহার্য। পবিত্র কোরআনে নির্দিষ্ট করেও এ দায়িত্বগুলোর প্রতি ইশারা করা হয়েছে। যেমন কাফের পিতামাতার প্রতি সদাচরণ (সূরা লুকমান : ১৫), মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকল আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের দান করা (সূরা বাকারা : ৮৩),

সার্বিকভাবে সকল প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথি, পথিক ও দাসদাসীর সাথে সদাচার ও তাদের অধিকার দান (সূরা নিসা : ৩৬), সকল মানুষের সাথে উত্তমভাবে কথা বলা (সূরা বাকারা : ৮৩), কাফের শত্রুর সাথেও যুদ্ধে সীমা লঙ্ঘন না করা (সূরা বাকারা : ১৯০), শত্রুকে যদি ক্ষমা করা সম্ভব না হয়, তবে সে যতটুকু অন্যায় করেছে ঠিক ততটুকুই শাস্তি দান করা (নাহল : ১২৬), যে সকল কাফের মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং কোন দেশ থেকে মুসলমানদের বহিষ্কার করতে তাদের স্বধর্মীদের সাহায্য করেনি, তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা (সূরা মুমতাহিনা : ৮)। এটা ইসলামের মানবতার দাবিদার হওয়ার চূড়ান্ত প্রমাণ যে, ইসলাম অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করাকে সমগ্র মানবজাতিকে হত্যার সমান জ্ঞান করেছে (সূরা মায়িদা : ৩২)।

সুতরাং যে ইসলাম অমুসলমানদের প্রতিও এতটা মহানুভবতা প্রদর্শন করেছে, তার অনুসারীদের মধ্যে কতটা অন্তরঙ্গতা ও সহমর্মিতা আশা করে কল্পনাও করা যায় না। এর নমুনা স্বয়ং কোরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে : 'তারা তাদের নিকট আসা হিজরতকারীদের ভালোবাসে এবং হিজরতকারীদের যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না এবং তারা অভাবগ্রস্ত হলেও নিজেদের ওপর তাদের (অপর মুমিনদের) অগ্রাধিকার প্রদান করে।' (সূরা হাশর : ৯)। কিন্তু আমরা আজ মুসলমানদের মধ্যে এরূপ ভ্রাতৃত্বের শুধু অনুপস্থিতিই লক্ষ্য করছি না; বরং দেখছি তাদের মধ্যকার চরমপন্থী একদল নির্দ্বিধায় অন্যদের রক্ত ঝরাচ্ছে। তারা ইসলামের ঘোর শত্রুদের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়ে মুসলিম উম্মাহকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সহানুভূতি ও সহনশীলতার সাথে এ সমস্যা মোকাবিলার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

নীতিবিজ্ঞান

এক নজরে আত্ম উন্নয়নের প্রক্রিয়া

এক নজরে আত্ম উন্নয়নের প্রক্রিয়া

মোহাম্মাদ আলী সোমালী

আত্ম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার নানা ধাপ বা পর্যায় রয়েছে। আমি এখানে সমস্ত প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে তুলে ধরব এবং এর প্রধান ধাপগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

১. নিজ সত্তা সম্পর্কে জাগ্রত বা মনোযোগী হওয়া : আত্ম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সর্বপ্রথম ধাপ হলো জাগ্রত হওয়া (ইয়াকযাহ)। আর তা হলো পার্থিব বিষয়াদিতে নিমগ্ন হওয়া থেকে জাগ্রত হওয়া এবং অমনোযোগিতাকে দূরে সরিয়ে দেয়া।

জাগ্রত হওয়ার অর্থ হলো কারো ধর্মানুরাগ, জীবন এবং আধ্যাত্মিকতার পরিচর্যার বিষয়টিকে স্মরণে রাখা। অনেক পণ্ডিত, যেমন ইমাম খোমেইনী (রহ.) ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রদের উদ্দেশে দেয়া তাঁর বক্তৃতাসমূহের সংকলন গ্রন্থ 'জিহাদ-ই আকবার' (সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ)-এ বলেছেন যে, আত্মশুদ্ধির প্রথম ধাপ হলো জাগ্রত হওয়া। কতিপয় অধ্যাত্মবাদী মনে করেন, এটি হলো কেবলই একটি প্রাথমিক ধাপ; আর প্রথম ধাপটি আসে জাগ্রত হওয়ার পরে। যা হোক, কোন সন্দেহ নেই যে, জাগ্রত হওয়াই হলো সূচনা বিন্দু। আমরা হয়তো বলতে পারি যে, আমরা সবাই জাগ্রত, কিন্তু এটি হলো ভিন্ন ধরনের জাগ্রত হওয়া।

اَلنَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوْا انْتَبَهُوْا

মহানবী (সা.) বলেন : 'মানুষ ঘুমন্ত আর তারা কেবল মৃত্যুর পরই জাগ্রত হয়।'[১]

যখন মানুষ মারা যায় তখন তারা জাগ্রত হয় এবং আর কখনও ঘুমায় না। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। তারা এমন ব্যক্তির মতো, যে ট্রেন চলে যাওয়ার পর অথবা পেন উড়ে যাওয়ার পর জাগ্রত হয়। এ সময়ে বিমানবন্দরে যাওয়ায় কোন লাভ নেই, যদিও আপনি এখন জাগ্রত। কারণ, আপনি ফ্লাইট মিস করেছেন। আপনি এখন যা করতে পারেন তা হলো নিজেকে দোষারোপ করা আর অনুতপ্ত হওয়া। আপনি হয়তো বলতে পারেন যে, পরবর্তী ফ্লাইট ধরবেন,

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আর কোন ফ্লাইট-ই নেই; এটাই এই পৃথিবীর শেষ ফ্লাইট। সেটাই ছিল সর্বশেষ ফ্লাইট এবং আমরা তা মিস করেছি। কারণ, আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম। অতএব, আসুন আমরা জাগ্রত হই। যদি আমরা কেবল মৃত্যুর পর সচেতন হই, তাহলে আমরা কোন কিছুই করতে পারব না, যেহেতু সেখান থেকে ফিরে আসার কোন সুযোগই নেই। ভালো কিছু করার জন্য যারা ফিরে আসতে চায় তাদের সম্পর্কে আলাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন যে, যদি তাকে একটি সুযোগ দেয়া হয়, তাহলেও সে পরিবর্তিত হবে না এবং তারপর কেন সুযোগ নেই; তারা সেখানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

দুর্ভাগ্যবশত মৃত্যু আমাদের কাছে এতটা পরিচিত অথবা স্বাভাবিক বিষয় হয়ে গেছে যে, আমরা চিন্তা করি না যে, আমরা মারা যাব এবং এটা সবসময় কারো না কারো ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। একজন ইরানী কবির মতে, আমরা একটি ভেড়ার পালের মতো, যাদেরকে একের পর এক কসাই খানায় নেয়া হচ্ছে, অথচ প্রত্যেকেই আনন্দ করছে; এটা চিন্তাই করছে না যে, সে হলো পরবর্তী জন।

হযরত মূসা (আ.)-এর একটি মন্তব্য হলো :

عَجِبْتُ لِمَنْ اَيْقَنَ بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَفْرَحْ

'আমি আশ্চর্যান্বিত হই তার ব্যাপারে, যে মারা যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত সে কিভাবে আনন্দ করে।'[২]

তাই আমাদের সতর্ক হওয়া এবং মৃত্যুর আগেই জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। কখনো কখনো কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রেক্ষিতে এটা ঘটে থাকে, যেমন কোন আত্মীয়ের মৃত্যু, প্রচণ্ড অসুস্থতা অথবা কোন ধার্মিক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ। কিন্তু এমন ঘটনা ঘটার জন্য আমাদের অপেক্ষা করা উচিত নয়; আমরা এমনিতেই পরিবর্তিত হতে পারি, যেহেতু আমাদের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটার কোন নিশ্চয়তা নেই।

জাগ্রত হওয়া খুবই সহজ। এটার জন্য কেবল ইচ্ছাশক্তি দরকার এবং আমাদের এ সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার যে, আলাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশে এই জীবন– এই যাত্রা কত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ! আমাদের অসীম যাত্রার জন্য পাথেয় সঞ্চয় করার জন্য এই একটি মাত্র সুযোগ আমাদের রয়েছে।

اِنَّ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ يَعْمَلاَنِ فِيْكَ فَاعْمَلْ فِيْهِمَا

ইমাম আলী (আ.) বলেন : 'দিন ও রাত তোমার ওপর অনবরত প্রভাব বিস্তার করছে, তুমিও তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার কর।'[৩]

এর অর্থ হলো আপনার জীবন দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি দিন ও রাত আপনাকে বার্ধক্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রতিটি দিন ও প্রতিটি রাত আপনাকে এই দুনিয়ায় আপনার জীবনকে সমাপ্তির নিকটবর্তী করছে, তাই কিছু করার চেষ্টা করচ্ন। আমাদের অবস্থা সম্পর্কে একটি সুন্দর উপমা রয়েছে। একজন মানুষের জন্য এই দুনিয়ার জীবনকে তুলনা করা হয় একটি দড়ির সাথে যে দড়ির সাহায্যে সে একটি গভীর কূপের মধ্যে নেমেছে এবং কেবল সেই দড়িটি ধরে আছে। যদি সে এই দড়িটি ছেড়ে দেয় তাহলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। কূপের ওপরে দুটি ইঁদুর রয়েছে– একটি সাদা ও একটি কালো। তারা দড়িটি কাটছে। এমন এক সময় আসবে যখন দড়িটি অবশ্যই ছিঁড়ে যাবে। ইঁদুর দুটি খুবই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আর তারা চলেও যাবে না। এই হলো আমাদের অবস্থা। দড়িটি হলো আমাদের জীবনের মতো। সাদা ইঁদুর হলো দিন আর কালো ইঁদুর হলো রাতের মতো। দিন ও রাত অনবরত আমাদের জীবনকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে এবং শ্রীঘ্র হোক বা দেরীতে– আমরা পতিত হব এবং মারা যাব। তাই আমাদেরকে জাগ্রত হতে হবে এবং আমাদের এই জীবন–আমাদেরকে প্রদত্ত এই সুবর্ণ সুযোগ–সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে।

২. নিজ সত্তা সম্পর্কে জানা : জাগ্রত হওয়ার পর আমাদেরকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে যে, কোন কোন সম্পদ, সুযোগ-সুবিধা এবং বেছে নেয়ার স্বাধীনতা আমাদের জন্য অবারিত রয়েছে। যখন আমরা জাগ্রত তখন আমরা কিছু একটি করতে চাই। এটা এমন কারো মতো যার কোন কাজ বা ব্যবসা নেই, আর তাই তার কোন আয়ের উৎসও নেই। প্রত্যেকেই তাকে দায়িত্বশীল হতে বলে এবং কিছু এটা করতে বলে। সেও একমত যে, তার কিছু করা উচিত, কিন্তু জানে না যে, সে কী করবে। সে শূন্য থেকে কিছুই করতে পারবে না। সবচেয়ে আগে তাকে আবিষ্কার করতে হবে যে, কোন ধরনের যোগ্যতা, সক্ষমতা ও পারদর্শিতা তার রয়েছে। তাকে জানতে হবে যে, কোন ধরনের সুযোগ তার জন্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, তার উচিত হলো বাণিজ্যিক বাজার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা। তার উচিত এ ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা যাতে তাদেরকে সে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে।

তার এটা দেখা উচিত যে, কারা দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে, যাতে তাদের অবস্থা থেকে সে শিক্ষা নিতে পারে এবং তাদের মতো হওয়া থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। এটাকে বলা হয় 'আত্মপরিচিতি' (মারেফাতুন নাফ্স)– যা সবচেয়ে উপকারী জ্ঞান হিসাবে বিবেচিত হয়। কেন আমরা সবসময় নিজেদেরকে ভুলে যেতে চাই এবং এর পরিবর্তে অন্য জিনিস সম্পর্কে জানতে চাই? দৃষ্টান্তস্বরূপ, কিছুসংখ্যক ব্যক্তি তাদের সারা জীবন কাটিয়ে দেয় একটি বিরল কীট-পতঙ্গের ওপর গবেষণায়, কিন্তু আলাহ্ তাদের নিজেদের মধ্যে যা দিয়েছেন তা খোঁজার জন্য একটি মাত্র ঘণ্টাও ব্যয় করে না।

মুসলিম অধ্যাত্মবাদীরা বলেন যে, দুটি জগৎ রয়েছে : বাহ্যিক জগৎ– যা আলাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট মানুষ, পশুপাখি, উদ্ভিদ এবং জড় বস্তুর সুন্দর প্রাকৃতিক জগতকে ধারণ করে আছে; আর আমাদের সত্তার মধ্যকার অভ্যন্তরীণ জগৎ। তাঁরা বলেন যে, এই জগৎটাই বৃহত্তর জগৎ। আলাহ্ আমাদের মধ্যে যে জগৎ দিয়েছেন তা আমাদের সত্তার বাইরের বস্তুজগতের চেয়ে অনেক বড়। এজন্যই আমরা একটি সুন্দর ঐশী বাণীতে (হাদীসে কুদসী) পড়ি :

لَمْ يَسَعْنِيْ سَمَائِيْ وَ لَا أَرْضِيْ وَسِعَنِيْ قَلْبُ عَبْدِى الْمُؤْمِنِ

'আমার জান্নাতও আমাকে ধারণ করতে পারে না, না আমার দুনিয়া, কেবল একজন মুমীনের হৃদয়ই আমাকে ধারণ করে আছে।'[৪]

এই হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের হৃদয় অবশ্যই সকল তারকা ও গ্রহের চেয়েও বড় হবে, আমরা যেসকল সৃষ্টি দেখতে পাই সেসকল সৃষ্টির চেয়েও বড় হবে।

আমরা প্রায়ই আমাদের পূর্ণতার জন্য আমাদের মধ্যে যে সম্ভাবনা রয়েছে সেটাকে অবমূল্যায়ন করি। আমাদের সামনে পূর্ণতার জন্য অসীম সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি সবচেয়ে পবিত্র ব্যক্তিও আরো সামনে অগ্রসর হতে পারেন। তাঁদের জন্য আরও অগ্রসর হওয়ার সুযোগ রয়েছে। কারণ, মানুষ এবং আলাহ্র মধ্যকার দূরত্ব অসীম। তাই উচ্চতর অবস্থানে যাওয়ার সম্ভাবনা সবসময়ই রয়েছে। এজন্যই আমরা নামাযে তাশাহহুদের পর প্রার্থনা করি : 'হে আলাহ্! আমাদের জন্য মহানবী (সা.)-এর শাফায়াতকে (সুপারিশ) গ্রহণ করুন এবং তাঁর মর্যাদাকে উন্নীত করুন।' এর অর্থ হলো যে, নবী (সা.) আরও উচ্চতর অবস্থানে যেতে পারেন।

আমাদের অনেকে আমাদের অর্জন নিয়ে খুব সহজেই সন্তুষ্ট হয়। আমাদের আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং আরও উচ্চতর আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। যদি আমরা অল্প কিছুতেই সন্তুষ্ট হই, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব, এমনকি আমরা সেই ছোট বিষয়গুলোও অর্জন করতে পারব না। বলা হয় যে, অনেক আগে একজন আলেম ছিলেন যাঁর সন্তান ধর্মবিষয়ক ছাত্র ছিল। পিতা তাঁর সন্তানকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ভবিষ্যতে সে কী হতে চায়। সেই সন্তান জবাব দিল যে, সে তার পিতার মতো হতে চায়। তখন পিতা বললেন যে, তিনি তাঁর সন্তানের জন্য দুঃখ বোধ করছেন। কারণ, তিনি নিজে যতটা সম্ভব তাঁর আদর্শ ব্যক্তিত্ব ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর মতো হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তারপরও যা তিনি অর্জন করেছিলেন তার অবস্থা ছিল এরূপ। তিনি তাঁর সন্তানকে বললেন যে, যদি সে কেবল তার পিতার মতো হতে চায় তাহলে সে কিছুই অর্জন করতে পারবে না। তাই আমাদের সবসময় বৃহৎ আকাঙ্ক্ষা থাকা প্রয়োজন এবং নিশ্চয়ই আলাহ্ আমাদের মধ্যে এমন সম্ভাবনা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমাদের নিজেদেরকে চিনতে হবে, আমাদের উচিত আমাদের মধ্যকার সম্ভাবনাগুলোকে বিশ্বাস করা এবং নানা রকম বিষয় যা আমাদের উপকার ও অপকার করতে পারে সেগুলো সম্পর্কে সতর্ক হওয়া।

৩. নিজ সত্তার যত্ন নেয়া : জাগ্রত হওয়া ও আত্মপরিচিতির পর আমাদের প্রয়োজন নিজ সত্তার যত্ন নেয়া। শুধু জ্ঞান অর্জন করাই যথেষ্ট নয়, বাস্তবে প্রয়োগের মাধ্যমে জ্ঞানকে আমাদের সেবায় নিয়োজিত করা উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি আপনি জানেন যে, ধুমপান মৃত্যু ডেকে আনে, অথচ আপনি আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন না হন এবং ধুমপান অব্যাহত রাখেন, তাহলে সেই জ্ঞানের কোন উপকারিতা নেই; বরং এটা আপনাকে আরো দায়িত্বশীল কওে; কারণ, আপনি জানেন। অবশ্যই এর অর্থ এ নয় যে, আপনি জ্ঞান অর্জন করা পরিহার করবেন। 'আমি জানি না'- এটা বলা কোন অজুহাত নয়। কুরআন বলে :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ

'হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের দায়িত্ব তোমাদের ওপরই ন্যস্ত, তোমরা যখন সঠিক পথে আছ তখন পথভ্রষ্টরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।' (সূরা মায়েদা : ১০৫)

যেহেতু ইসলাম এমন ধর্ম যা আমাদের জাগ্রত ও সচেতন হওয়ার সকল চেতনা নিয়ে এবং আমাদের জন্য উপকারী ও অপকারী বিষয় জেনে সক্রিয়ভাবে সামাজিক জীবনে নিয়োজিত হতে বলে সেহেতু নিজের প্রতি যত্ন নেয়ায় সামাজিক দায়িত্ব পালনের অনুশীলনেরও সূচনা হয়।

যা হোক, এ অবস্থায় মানুষের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় ঘটে থাকে। যখন তারা আধ্যাত্মিক বিষয়ে সচেতন এবং স্পর্শকাতর হয় তখন দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা নিজেদের ধার্মিকতার বিষয়ে চিন্তাভাবনার পরিবর্তে, নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে অধিক ব্যস্ত হওযার পরিবর্তে অন্যদের ব্যাপারে মূল্যায়ন করতে শুরচ করে। উদাহরণস্বরূপ, তারা চিন্তা করতে শুরচ করে যে, এই ব্যক্তিটি অপদার্থ, ঐ ব্যক্তিটি অসচেতন, অন্য একজন প্রকৃতপক্ষেই বিশ্বাসী নয় ইত্যাদি। এটি খুবই বিপজ্জনক। সর্বপ্রথম এবং সর্বোপরি একজন প্রকৃত মুমীনের উচিত হলো নিজের সমস্যাবলি নিয়ে ব্যস্ত থাকা। আমরা হাদীস থেকে বুঝতে পারি যে, অন্যদের সম্পর্কে চিন্তা করা এবং তাদেরকে মূল্যায়ন করার চেয়ে আমাদের সমস্যাবলি ও অসুস্থতা খুঁজে বের করার জন্য ব্যস্ত থাকাই হলো আমাদের জন্য অধিকতর উত্তম। উদাহরণস্বরূপ : মহানবী (সা.) বলেন :

طُوْبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوْبِ غَيْرِهِ

'ধন্য হোক সেই ব্যক্তি যে নিজের ত্রুটি সম্পর্কে চিন্তায় ব্যস্ত থাকে, অন্যদের ত্রুটি সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য তার কোন সময় নেই।'[৫]

অতঃপর আমাদের অবশ্যই অন্যদের প্রতি নজর দেয়ার আগে নিজেদের সমালোচনা ও মূল্যায়ন করতে হবে। কখনো কখনো আমাদের মধ্যে বিরাট সমস্যা থাকে, কিন্তু আমরা এ সম্পর্কে সচেতন নই এবং সেই একই সমস্যার স্বল্প পরিমাণ অন্য কারো মধ্যে থাকলে সেটার প্রতি দৃষ্টি দেই। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, আমরা অনেক সময় রসুন খেয়ে থাকি এবং বুঝি না যে, আমাদের মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। কিন্তু যখন আমরা এমন কারো সাথে সাক্ষাৎ করি যার মুখ থেকে একই রকম গন্ধ বের হচ্ছে তখন আমরা খুব দ্রচত চিন্তা করি অথবা তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করি। মাওলানা রচমীর মসনভীতে একটি গল্প রয়েছে : দুপুরের নামাযের পর চার ব্যক্তির বাদশাহের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার কথা ছিল। তারা বাদশাহের সাথে সাক্ষাতের এ সুযোগ যেন হারাতে না হয় সে ব্যাপারে খুবই সজাগ ছিল এবং

কোনভাবেই যেন দেরী না হয় সেটাই কামনা করছিল। তাই তারা তাড়াতাড়ি নামায আদায় করে বাদশাহের সাথে দেখা করতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। তারা মসজিদে পৌঁছে নামায পড়তে শুরচ করল। যখন তারা নামায পড়ছিল তখন মিনারে উঠে আযান দেয়ার জন্য মুয়াজ্জিন সাহেব মসজিদে আসলেন। তারা এখন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেল এবং ভাবতে লাগল যে, তারা কি নামাযের ওয়াক্তের আগেই নামায পড়া শুরচ করেছে নাকি সেইদিন মুয়াজ্জিন দেরীতে এসেছেন। তাই নামাযের অবস্থাতেই তাদের একজন মুয়াজ্জিনকে জিজ্ঞাসা করল যে, নামাযের সময় হয়েছে কিনা? দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করল, কেন সে নামাযরত অবস্থায় কথা বলল। 'নামাযের সময় হয়েছে কিনা'– এ প্রশ্নের মাধ্যমে সে তার নামায বাতিল করে ফেলেছে। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, দ্বিতীয় ব্যক্তিও প্রথম ব্যক্তিকে কথা বলার কারণ জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে নামাযের মধ্যে কথা বলেছে। আর চতুর্থ ব্যক্তি নিজেকে চালাক মনে করল। সে বলল : 'আলাহ্‌কে ধন্যবাদ যে, আমি কথা বলিনি।' এই গল্পে আমরা দেখি যে, চার ব্যক্তি একই সমস্যায় পড়েছে, কিন্তু প্রত্যেকে তা কেবল অন্যের মধ্যে দেখতে পেয়েছে– নিজের মধ্যে তা দেখতে পায়নি। বস্তুত তারা সবাই যে ভুলের পুনরাবৃত্তি করেছে সেটার জন্যই তারা একে অপরের সমালোচনা করেছে। সুতরাং এটাই উত্তম যে, অন্য মানুষের বিষয়াদির চেয়ে আমাদের নিজেদের বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি দেয়া।

কখনো কখনো মানুষ ভাবে যে, এর অর্থ হলো তাদের চারপাশে সমাজে যা ঘটছে তা থেকে তাদের দূরে থাকা উচিত। প্রকৃতপক্ষে এটি তেমন নয়। কিন্তু যদি আমরা আমাদের সমাজের জন্য আরো কল্যাণকর ভূমিকা পালন করতে চাই, তাহলে আমাদের উচিত নিজেদের থেকে শুরচ করা। তারপর আমরা অন্যদের সাহায্য করতে পারব। যেমন আমরা দেখি, একটি পেনে যখন আমাদেরকে ইমারজেন্সি অক্সিজেন মাস্ক ব্যবহার করার নির্দেশনা দেয়া হয় তখন সবসময় আমাদের নিজেদেরকে আগে মাস্ক পরার জন্য বলা হয় এবং তারপর আমাদের পাশে যে ব্যক্তি রয়েছে তাকে সাহায্য করার জন্য বলা হয়। অন্যথায় সম্ভাবনা রয়েছে যে, যখন আমরা অন্যদেরকে মাস্ক পরায় সাহায্য করতে রত হব তখন আমরা নিজেরাই অসুস্থ হয়ে পড়ব। তাই আমাদের উচিত আত্মসচেতন হওয়া বা নিজেদের যত্ন নেয়া। কিন্তু কিভাবে আমরা আমাদের যত্ন নিব? আমরা কি কেবল নামায আদায় করব ও কুরআন পড়ব? অথবা আমরা কি কেবল সামাজিক কর্মকাণ্ড করার মাধ্যমে সমাজের সেবা করব?

৩ ক. যথাযথ বিশ্বাস অর্জন : সবচেয়ে আগে যে জিনিসটি আমাদের করা দরকার তা হলো যথাযথ বিশ্বাস অর্জন এবং দুনিয়া সম্পর্কে যথাযথ ধারণা অর্জন। যদি আপনি একজন ভাল ব্যবসায়ী হতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই সেই ব্যবসা সম্পর্কে এবং যারা সেই ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে সেসব লোক সম্পর্কে জানতে হবে। আপনাকে বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং যেসব উপাদান এই বিশেষ ব্যবসায় ক্রিয়াশীল তা জানতে হবে। আমরা যদি এই পৃথিবীতে সফল হতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে কে সেই যার নিয়ন্ত্রণ এখানে রয়েছে। যদি আমরা একটি ব্যবসা শুরচ করার অনুমতি চাই, তাহলে আমাদের জানা উচিত যে, সেই অনুমতি নেয়ার জন্য কোথায় যেতে হবে। একইভাবে যদি আমরা একটি আধ্যাত্মিক 'ব্যবসা' করতে চাই, তাহলে আমাদের জানা উচিত কোথায় সেই অনুমতি পাওয়া যাবে। আমাদের জানা উচিত কী কী আইন এখানে কার্যকর এবং কোন কোন নিয়ম পালন করতে হবে। আমাদের জানতে হবে কোন কোন সুযোগ দেয়া হয়েছে এবং কোন ধরনের ঋণ ও মঞ্জুরী আমাদের দেয়া হবে।

গোলেস্তান ও বোস্তান গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা মহান ইরানী কবি সা'দী একটি সুন্দর গল্প বলেছেন। তিনি বলেন, একদা এক লোক অন্য একটি শহরে ব্যবসা করার জন্য গিয়েছিল। সে দেখল যে, সেই দেশে গণগোসলখানায় তারা যে ঘণ্টি ঝুলিয়ে রাখে তা খুবই সস্তা। যেমন যদি সেই ঘণ্টির মূল্য তার দেশে ১০০ ডলার হয় তাহলে এই দেশে তা ১ ডলার। তাই সে তার সকল দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে দিল এবং এর সাথে নিজের যা অর্থ ছিল সব মিলিয়ে সে হাজার খানেক ঘণ্টি কিনল। সে মনে মনে ভাবল যে, দেশে ফিরে ঘণ্টি প্রতি ৯৯ ডলার মুনাফা করবে। তাই সে তার ঘণ্টি নিজের শহরে পরিবহন করে নিয়ে গেল। কিন্তু সমস্যা হলো তার শহরে মাত্র দু'টি বা তিনটি গোসলখানা ছিল এবং তারা কেউ এ ঘণ্টি কিনতে চাইল না। সে ঘণ্টির মূল্য অর্ধেক করে দিলেও কেউ তা কিনতে আগ্রহী হলো না। তাই সে তার সমুদয় পুঁজি হারিয়ে ফেলল এবং দেউলিয়া হয়ে গেল। সে মোটেও জানত না যে, তার শহরের জন্য কোন ধরনের পণ্য কেনা সঠিক হবে।

অনেক মানুষই এমন এবং এই দুনিয়াতে এমন বিষয়ে বিনিয়োগ করে যার পরকালে কোন মূল্য নেই। আমরা আমাদের জীবন বিনিয়োগ করি, যা আমাদেরকে দেয়া

সবচেয়ে মূল্যবান 'পুঁজি'। যখন আমরা পরকালে পৌঁছব তখন আমাদের বলা হবে আমরা অনর্থক বিষয়ে বিনিয়োগ করে এই 'পুঁজি'র অপচয় করেছি।

তাই আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করা প্রয়োজন এবং সেই পথ চেনা প্রয়োজন যে পথে আমাদের এই দুনিয়ার জীবন পরবর্তী জগতে আমাদের সুখ নিশ্চিত করতে পারে। আমাদেরকে অবশ্যই সঠিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে হবে এবং আমাদের এই দুনিয়ার জীবন ও পরকালীন জীবনের মধ্যকার সম্পর্ক অনুধাবনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে যত্নশীল হতে হবে। মহিমান্বিত কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পরকাল সম্পর্কে কথা বলে। আমাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য এর ওপর ব্যাপক গুরচত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, চিরকালীন জীবন এমন একটি বিষয় যার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই সত্যিকারভাবে প্রস্তুত হতে হবে।

আরেকটি উপকারী দৃষ্টান্ত হাদীসসমূহে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। একটি গল্পে এমন এক ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে যে দিনরাত ইবাদত করত। একদিন একজন ফেরেশতা তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি ভাবলেন যে, এমন নিবিষ্টতার সাথে ইবাদত করার কারণে এই ব্যক্তি অবশ্যই অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা লাভ করেছে। যখন সেই ফেরেশতা তার নিকটে গেলেন তখন তিনি বুঝলেন যে, আল্লাহ সম্পর্কে এই ব্যক্তির যথাযথ পরিচিতি নেই। কারণ, সে বলল : '(হে আল্লাহ!) তোমার যদি একটি গাধা থাকত, তাহলে আমি সেটাকে আমার চারণভূমিতে চরাতাম, যেহেতু আমার এখানে প্রচুর ঘাস রয়েছে।' এই ব্যক্তি আলাহকে একজন মানুষের মতো মনে করেছিল যার একটি গাধা থাকতে পারত। এই ধরনের বিশ্বাস পুরস্কারযোগ্য নয়, তাই প্রথমেই আবশ্যিকভাবে আমাদের আকীদা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। আমাদের অবশ্যই স্রষ্টা মহান আলাহর একত্ব, পৃথিবীতে তাঁর মর্যাদা, নবীদের নবুওয়াত এবং পরকাল সম্পর্কে যথাযথ পরিচিতি অর্জনের জন্য চেষ্টা চালাতে হবে।

অতএব, প্রথমে আমাদের জন্য প্রয়োজন সঠিক বিশ্বাস, কিন্তু সেরকম বিশ্বাস নয় যা আমরা সাধারণভাবে শিখি এবং তোতা পাখির মতো পুনরাবৃত্তি করি। এটা এমন ধরনের বিশ্বাস যা আমাদের সত্তায় এমনভাবে মিশে যাবে যে, যদি আমরা বলি : 'আলাহ এক-অদ্বিতীয়', তাহলে আমাদের সমস্ত দেহ ও আত্মা ঘোষণা করবে যে, আমরা তাওহীদবাদী।

৩ খ. ধর্মীয় দায়িত্ব পালন এবং গুনাহ ও শয়তানি কর্মকা- থেকে বিরত থাকা : আমাদের চেষ্টা করা উচিত আমাদের ওপর ফরয কাজগুলো আঞ্জাম দেয়া এবং আমাদের বিশ্বাসের দাবিগুলো পূরণ করা। এমনকি যদি আমাদের যথাযথ বিশ্বাস থাকে এবং আমরা সকল ওয়াজিব দায়িত্ব পালন করি, কিন্তু গুনাহ পরিত্যাগ না করি তাহলে আমরা সফলকাম হব না। যদি কেউ একদিন তার হাত দশবার ধোয়, কিন্তু অনবরত নোংরা ও দূষিত জিনিস স্পর্শ করতে থাকে, তাহলে তার হাত আবার ময়লা হয়ে যাবে। এ কথা বলায় কোন লাভ নেই যে, সে সেই দিন দশবার তার হাত ধুয়েছে। দৈনন্দিন নামায একটি আধ্যাত্মিক গোসলের মতো যা আমাদেরকে পরিষ্কার করে, কিন্তু যদি আমরা তার পরে একই কাজ আবার করি, তাহলে আমরা আবার আমাদেরকে ময়লাযুক্ত করে ফেলব।

একটি চমৎকার উদাহরণ রয়েছে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে যার একটি থলে রয়েছে এবং সে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যার মধ্যে ক্রয় করা জিনিসপত্র রাখে। কিন্তু থলের নিচে একটি বড় ছিদ্র রয়েছে আর তাই সে যা কিছু ঐ থলেতে রাখে সেই ছিদ্র দিয়ে তা পড়ে যায়। সে আশ্চর্যান্বিত হয় এবং ভাবে, এটা কিভাবে সম্ভব যে, সে এই থলের ধারণক্ষমতার দশগুণ জিনিস এর মধ্যে রেখেছিল, কিন্তু এটা খালিই রয়ে গেছে! সে চিন্তা করে যে, সবকিছু কোথায় যাচ্ছে। একইভাবে আমরা আলাহ্র ইবাদত করি– বয়সভেদে দশ, বিশ, ত্রিশ অথবা চলিশ বছর। কিন্তু এই ইবাদতের ফলাফল কোথায়? কেন আমরা এখনও সেই একই রকম? রমযান মাসের পরও কেন আমরা পূর্বে যেমন ছিলাম তেমনই রয়ে গেছি? এটা এ কারণে যে, আমরা ভালো কাজ করি, কিন্তু এর সাথে সাথে আমরা মন্দ কাজও করি। একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত মাওলানা রূমী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে : একজন কৃষক ছিল যে গম চাষ করত এবং শীতকালের জন্য মজুত করে রাখবে বলে তা কেটে এনে গুদাম ঘরে রাখত। কিন্তু যখনই সে গুদাম ঘরে যেত তখনই লক্ষ্য করত যে, গমের মজুত পূর্বের চেয়ে কমে গেছে এবং গুদামঘর কখনই পূর্ণ হচ্ছে না।

তাই সে আশ্চর্যান্বিত হলো। বিশেষ করে গুদামঘরটি সবসময় তালাবদ্ধ থাকত যাতে কেউ তা থেকে কিছু বের করার জন্য ঢুকতে না পারে। সে সবসময় দরজা তালাবদ্ধ করার ব্যাপারে সজাগ ছিল। তাই সে সিদ্ধান্ত নিল যে, এক রাতে সে গুদামঘরে সারা রাত জেগে থাকবে যাতে কী ঘটে তা দেখতে পারে। মধ্যরাতের পর সে দেখতে

পেল যে, কয়েকটি বড় ইঁদুর এসে গম নিয়ে গুদামঘরের বাইরে চলে যাচ্ছে। এরপর সে বুঝতে পারল যে, এগুলোই হলো সমস্যার কারণ। তাই রশ্মী আমাদের বলছেন, আমরা এই রকম। আমাদের হৃদয়ে কিছুসংখ্যক ইঁদুর আছে যেগুলো আমাদের ভালো কাজগুলোর আলো ছিনিয়ে নেয়। যদি আমাদের হৃদয়ে কোন ইঁদুর না থাকে, তাহলে চলিশ বছরের রোযার আলো, হজে যাওয়ার আলো ইত্যাদি কোথায়? তাই কোন পাপকাজ না করার ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হতে হবে। এমনকি আমাদের একটি গুনাহও করা উচিত নয়।

আমরা মানুষ আর তাই আমরা ভুল করতেই পারি, কিন্তু সত্যিকার মুমীন হলো সেই ব্যক্তি, যে ভুল করলে প্রথমত সবসময় দুঃখিত হয় এবং এ ব্যাপারটি তার কাছে অপ্রীতিকর হয়, দ্বিতীয়ত সে দ্রচত অনুতাপ করে এবং একই ভুল পুনরায় না করার ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়। তাই যদি আমরা পাপ করি, তাহলে অবশ্যই যত দ্রচত সম্ভব আমাদেরকে অনুতাপ করতে হবে।

দুর্ভাগ্যবশত আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে আগ্রহীদের মধ্যে এমন মানুষও আছে যারা মনে করে ধর্মীয় বিধিবিধান (শরীয়ত) শুধু দরকার শুরচতে এবং তারপর থেকে আমাদের কেবল আধ্যাত্মিক সফরের (তরীকত) প্রয়োজনীয় বিষয়াদি জানা দরকার। কখনো তারা বলে, এটা তাদের মতো যারা শাঁস পর্যন্ত বা মর্মবস্তুতে পৌঁছে গেছে এবং তাদের জন্য খোসার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটি একটি ভুল ধারণা। কারণ, আমাদের সবসময় শরীয়ত পালন করা প্রয়োজন। মহানবী (সা.) এবং তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের ইমামগণ সবসময় শরীয়ত অনুসরণ করেছেন এবং এমন কেউ নেই যে তাঁদের চেয়ে অধিক ধার্মিক হওয়ার দাবি করতে পারে।

ইতিহাসে এমন কোন ঘটনার উলেখ নেই যেখানে বলা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) কোন গুনাহ করেছেন (নাউযুবিলাহ) এবং তারপর বলেছেন যে, তাঁর জন্য এটা করা ঠিক ছিল। যেমন তিনি কখনোই বলেননি যে, আমাদের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা উচিত নয়, কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে তা বলার অনুমতি ছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমানে আমরা দেখি যে, কিছুসংখ্যক তথাকথিত মুসলমান এমন লোকদের অনুসরণ করে যারা নিজেদেরকে প্রভু বা ইমাম বলে জাহির করে, কিন্তু নিজেরা ধর্মের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো মানে না এবং এখনো তাদের অনুসরণকারীরা তাদেরকে বিশ্বাস করে এবং মনে করে যে, তারা তাদের অবৈধ কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত হবে না।

যাহোক, আহলে বাইতের মাজহাব অনুযায়ী এই বিষয়টি খুবই স্পষ্ট। আমাদের অবশ্যই শরীয়ত মেনে চলতে হবে, কিন্তু কেবল এতটুকুই যথেষ্ট নয়।

শরীয়তের প্রতি লক্ষ্য করার দুটি ভিন্ন পথ রয়েছে। একটি হলো এটা বিশ্বাস করা যে, শরীয়ত হলো কেবল সূচনাকারীর জন্য এবং এরপর যখন আমরা উচ্চতর স্তরে উন্নীত হই তখন আমাদের শরীয়তের কোন প্রয়োজন নেই। কিছুসংখ্যক সূফি এমনই করেন। দ্বিতীয় পথ হলো এটা বলা যে, শরীয়ত সবসময়ই প্রয়োজন, কিন্তু কেবল শরীয়ত পালন করার মাধ্যমে আমরা নিম্নতর স্তরেই রয়ে যাব। যদি আমরা উচ্চতর স্তরে উপনীত হতে চাই, তাহলে শরীয়ত পালনের চেয়েও বেশি কিছু করা উচিত অর্থাৎ কেবলই ধর্মীয় আচার পালনের উর্ধ্বে উঠে সেগুলোর মধ্যকার আধ্যাত্মিক চেতনা আবিষ্কার করার চেষ্টা করা উচিত। প্রাইমারি স্কুলে অধ্যয়নরত একজনের দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করতে পারে। যদি কেউ প্রাইমারি স্কুলে পড়ে এবং এটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তার শিক্ষা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। সেই ব্যক্তির মাধ্যমিক স্কুল, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমরা বলতে পারি না যে, আমরা মাধ্যমিক স্কুলে যাব আর প্রাইমারি স্কুলে যা শিখেছিলাম তার সবকিছু ভুলে যাব। অথবা আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব তখন উচ্চ বিদ্যালয়ে যা কিছু শিখেছি সবকিছু ভলে যাব। এটা কোন কাজের কথা নয়। তবে এটা উলেখ করার বিষয় যে, কোন কিছুই ফরয পালন এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। নাহজুল বালাগায় ইমাম আলী (আ.) বলেন :

لاَ تَكُنْ مِمَّنْ يَرْجُوْ الْآخِرَةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ وَ يُؤَخِّرُ التَّوْبَةَ بِطُوْلِ الْأَمَلِ

'তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না যারা আমল (কর্ম) ব্যতীত পরকালের আশা করে এবং অতিরিক্ত আশাবাদী হওয়ার কারণে তওবাকে পিছিয়ে দেয়।'[৭]

যদি আমরা যথাযথ অনুশীলন অল্প অল্প করে অব্যাহত রাখি, তাহলে আমাদের কর্মের আলো আমাদের অন্তরগুলোকে আলোকিত করবে। এমনকি যদি অল্প পরিমাণে ভালো কাজ করেন, তাহলেও এটি গঠিত হতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি কোন গুনাহ না করেন। মহানবী (সা.) আবু যারকে বলেন :

يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيْ مِنَ الدُّعَاءِ مَعَ الْبِرِّ مَا يَكْفِى الطَّعَامَ مِنَ الْمَلْحِ يَا أَبَا ذَرٍّ– مَثَلُ الَّذِيْ يَدْعُو بِغَيْرِ عَمَلٍ كَمَثَلِ الَّذِيْ يَرْمِيْ بِغَيْرِ وَتَرٍ

'হে আবু যার! তোমার সৎকর্মের অনুপাতেই দোয়ার অধিকার তোমার রয়েছে যেমন তোমার খাবারের অনুপাতেই কেবল তুমি লবণ চাইতে পার। হে আবু যার! যে ব্যক্তি কোন সৎকর্ম ছাড়া দোয়া করে, সেই ব্যক্তি তার মতো যে কোন ধনুক ছাড়া তীর নিক্ষেপের চেষ্টা করে।'৮

অন্যদিকে যদি কোন ব্যক্তি গুনাহ করে তাহলে তার অনেক ভালো কাজ কোন কাজে আসবে না। আমরা ভালো কাজ দ্বারা খারাপ কাজের ক্ষতিপূরণ করতে পারব না। কুরআন বলে :

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

'আলাহ কেবল ধার্মিকদের থেকেই গ্রহণ করেন।' (সূরা মায়েদা : ২৭)

৩ গ. উত্তম চরিত্র অর্জন ও মন্দ চরিত্র বর্জন : যথাযথ বিশ্বাস স্থাপন, ওয়াজিব দায়িত্ব পালন এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে আমাদের প্রয়োজন হলো আমাদের হৃদয় বা আত্মার গুণাবলির দিকে লক্ষ্য করা এবং আমাদের মধ্যে কোন ভালো গুণের ঘাটতি রয়েছে তা খুঁজে বের করা যাতে আমরা সেগুলো অর্জন করতে পারি এবং কোন খারাপ বৈশিষ্ট্য আমাদের মধ্যে রয়েছে তাও খুঁজে বের করা যাতে আমরা তা দূর করতে পারি। এগুলো আমরা সাধারণত নীতিশাস্ত্রে শিক্ষা করে থাকি এবং তা যথাযথ বিশ্বাস ও উত্তম কর্ম সম্পাদনের চেয়ে অধিক কঠিন। আমাদের প্রায়ই এমন খারাপ বৈশিষ্ট্য থাকে যা পরিবর্তন করা কঠিন, এমনকি শনাক্ত করাও কঠিন। কারণ, সেগুলো আমাদের সত্তার অংশ হয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদেরকে সংগ্রাম করতে হবে এবং আমাদের জন্য এগুলো থেকে আরোগ্য লাভের প্রয়োজন রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ একজন ভীরচ প্রকৃতির মানুষের কথা বলা যায়। যখনই অন্ধকার ঘনিয়ে আসে সে ভীত হয়ে পড়ে। কখনো কখনো সেই মানুষ এই ভীতিকে উপেক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, কিন্তু এটি আসলেই খুব কঠিন এবং এর জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। এটি একটি ক্যান্সারের মতো যার জন্য কঠিন থেরাপি দরকার।

প্রথমত আমাদেরকে নিজেদের মন্দ অভ্যাসগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে এবং তারপর আমাদের উচিত নিজেরাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া যে, আমরা আমাদের সেই মন্দ অভ্যাস অনুযায়ী কোন কাজ করব না। কারণ, যদি আমরা একটি মন্দ অভ্যাস অনুযায়ী কাজ

করতে থাকি, তাহলে তা ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে যাবে। আমাদের কোন মন্দ অভ্যাস থাকতে পারে যা আমরা দ্রচত পরিত্যাগ করতে পারি না, কিন্তু যদি আমরা সেই কাজ না করতে থাকি তাহলে আস্তে আস্তে সেই কাজ করার প্রবণতা আমাদের মধ্যে কমে আসতে থাকবে। কিছু নির্দিষ্ট মন্দ অভ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিও রয়েছে। সাধারণ উপদেশ সেই মন্দ অভ্যাসকে দূর করার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং সেগুলোর জন্য বিশেষ ধরনের পদ্ধতির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেমন যদি কেউ ধুমপান পরিত্যাগ করতে চায় তাহলে এই মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি রয়েছে যেটা অন্য অভ্যাস দূর করার ক্ষেত্রে কার্যকর নয়।

কখনোও অনেক দিন যাবৎ আপনি মনে করতে পারেন যে, আপনি উত্তম এবং তারপর হঠাৎই আপনি বুঝতে পারবেন যে, আপনি আসলে উত্তম নন। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো, কেউ হয়তো সবসময় জামায়াতের প্রথম কাতারে উপস্থিত থাকে এবং মনে করে যে, সে একটি উত্তম কাজ করছে, কিন্তু অনেক বছর পর সে বুঝতে পারল যে, এটা আসলে আলাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নয়। কারণ, একদিন সে মসজিদে দেরিতে এসে জামায়াতের শেষ কাতারে দাঁড়িয়েছিল, তখন সে এই ভেবে লজ্জিত হলো যে, লোকেরা তাকে দেখে হয়তো মনে করছে যে, সে আজ প্রথম কাতারে দাঁড়াতে পারেনি। আর এতেই সে বুঝতে পারল যে, তার ঐ কাজ ছিল মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য যাতে মানুষ বলে : 'তিনি সবসময় আগে আসেন এবং নামাযের প্রথম কাতারে দাঁড়ান।' বিপরীতক্রমে, কেউ হয়তো মরহুম আয়াতুলাহ্‌ খুইয়ের শিক্ষক আয়াতুলাহ্‌ শেইখ মুহাম্মাদ হুসাইন ইসফাহানী কারায়ীর একটি ঘটনার কথা উলেখ করতে পারেন। একদিন নাজাফের রাস্তায় কিছুসংখ্যক লোক দেখল যে, তিনি হাসছেন এবং তাঁকে বেশ খুশি মনে হচ্ছে। তাঁকে একজন জিজ্ঞাসা করল যে, তিনি কেন এত খুশি। আয়াতুলাহ্‌ জবাব দিলেন যে, তাঁর শাকসব্জির থলেটি পড়ে গিয়েছিল এবং তিনি পড়ে যাওয়া শাকসব্জি কুড়াতে শুরচ করেছিলেন আর তাঁর খেয়াল ছিল না যে, লোকজন তা দেখছে। এই বিষয়টি তাঁকে খুব আনন্দিত করে। কারণ, হাওযায় (ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রে) পড়াকালীন একেবারে গোড়ার দিকের একটি ঘটনা তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে তাঁর একটি মূল্যবান তসবিহ ছিল যেটার কারণে তিনি নিজেকে বিত্তবানের মতো মনে করতেন। একদিন সেই তসবিহটি ছিঁড়ে এর দানাগুলো মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি এর দানাগুলো মাটি থেকে কুড়াননি। কারণ, তিনি চাননি যে, লোকেরা তাঁকে তা কুড়াতে দেখুক।

কিন্তু বর্তমানে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন, একজন বড় পণ্ডিত বা বিদ্বান হয়েও তাঁর অন্তরে অস্বস্তি বা খারাপ অনুভূতি জাগ্রত হয়নি এই ভেবে যে, লোকেরা তাঁকে রাস্তা থেকে সব্জি কুড়াতে দেখছে। এই মুহূর্তে তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর মধ্যে অহংকারের কোন অনুভূতি আর নেই।

'মিরাজুস সায়াদাত' এবং 'জামিউস সাদাত' গ্রন্থদ্বয় থেকে আমরা আমাদের হৃদয়ের নানা দিক সম্বন্ধে এবং সেগুলোর প্রতিটির ভালো ও মন্দ বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে জানতে পারি। একই সাথে আমরা সৎ গুণাবলি অর্জনের এবং মন্দ বৈশিষ্ট্য দূরীকরণের পথ ও পদ্ধতি সম্বন্ধেও জানতে পারি।

৩ ঘ. আত্মোন্নয়নের প্রক্রিয়া চলমান রাখা যতক্ষণ না একজন তার প্রভুর প্রকৃত দাসে পরিণত হয় যে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করে : আমাদের উচিত হলো আত্মোন্নয়নের প্রক্রিয়া চলমান রাখা। এটি জীবনব্যাপী একটি যুদ্ধ যা একটি মাস বা একটি বছর বা দশ বছরের কোন সময়সীমায় আবদ্ধ নয় যাতে সেই সময়ের পর আমরা অনুভব করতে পারি যে, আমরা তা সম্পন্ন করেছি এবং নিজেদেরকে অব্যাহতি দেব। বিপরীতক্রমে আমরা যতদিন এ দুনিয়ায় রয়েছি– আমাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, আমাদেরকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। আর আমরা অবশ্যই কোন সুযোগেরই অপচয় করব না। অবসর গ্রহণের বা আত্মোন্নয়নের কোন বয়স নেই। কারণ, আমরা যা-ই অর্জনে সক্ষম হই না কেন, প্রথমত কোনই নিশ্চয়তা নেই যে, আমরা তা সংরক্ষণ করতে পারব এবং দ্বিতীয়ত, যদি আমরা তা সংরক্ষণ করতে সক্ষম হই, তবুও তা আমাদের চিরকালীন যাত্রার জন্য যথেষ্ট পাথেয় বলে গণ্য হবে না। কুরআন মজীদ বলছে :

وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأۡتِيَكَ ٱلۡيَقِينُ ٩٩

'এবং তোমার নিকট মৃত্যু উপস্থিত হওয়া অবধি তোমার প্রতিপালকের উপাসনা করতে থাক।'- (সূরা হিজর : ৯৯)

মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত শিথিলতা প্রদর্শন, অবসর গ্রহণ বা বিশ্রামের কোন সুযোগ নেই। ইনশাআল্লাহ যখন আমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করব, তখন আমরা বিশ্রাম নেব। তাই আমাদেরকে অবশ্যই এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে

হবে যতক্ষণ না আমরা তাঁর সাথে মিলিত হই এবং তিনি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হন। একটি চমৎকার গল্প আমাদের অবস্থাকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করে।

একদল লোককে একটি অন্ধকার সুরঙ্গে পাঠানো হচ্ছিল। তাদেরকে বলা হলো যে, যখন তারা করিডোরে প্রবেশ করবে তখন এটা খুব অন্ধকার থাকবে এবং তারা কিছুই দেখতে সক্ষম হবে না। তাদেরকে সুরঙ্গের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় যেতে বলা হলো এবং বলা হলো মেঝেতে কিছু পাথর রয়েছে সেগুলো তারা নিবে এবং এগুলো বের করে আনবে। তাদেরকে আরো বলা হলো যে, তারা যদি পাথর নেয় তাহলেও আফসোস করবে, আর যদি তারা পাথর না নেয় তাহলেও আফসোস করবে! তারপর তাদেরকে সেই করিডোরে পাঠানো হলো। কেউ কেউ ভাবল যে, পাথর সংগ্রহ করে কোন লাভ নেই, কারণ, তাতেও তারা অনুতপ্ত হবে। অন্যরা কৌতুহলবশত ভাবল যে, তারা কিছু পাথর সংগ্রহ করে দেখবে যে, সেগুলো আসলে কী, যদিও তারা পরে অনুতপ্ত হবে। তারপর কিছুসংখ্যক ব্যক্তি পাথর সংগ্রহ করল আর কিছুসংখ্যক ব্যক্তি পাথর সংগ্রহ না করেই সেই করিডোর থেকে বের হয়ে আসল।

তারা যখন দিনের আলোয় বাইরে এল, তখন যারা পাথর সংগ্রহ করেছিল তারা দেখল যে, পাথরগুলো আসলে খুবই মূল্যবান রত্ন। যারা কোন পাথরই সংগ্রহ করেনি তারা তা দেখল এবং প্রচণ্ড রাগান্বিত হলো। তারা প্রতিবাদ করা শুরচ করল এই বলে যে, কেন তাদেরকে বলা হলো যে, তারা পাথর সংগ্রহ করলেও আফসোস করত। তখন তাদেরকে বলা হলো যে, যারা পাথর সংগ্রহ করেনি তারা এ কারণে আফসোস করছে যে, কেন তারা পাথর সংগ্রহ করেনি। আর যারা কিছু পাথর সংগ্রহ করেছিল তারাও অনুতপ্ত এ কারণে যে, কেন তারা আরো অধিক পাথর সংগ্রহ করেনি এবং তারা এখন কামনা করছে যে, যদি তারা তাদের পকেট ভর্তি করে পাথর সংগ্রহ করত! সুতরাং আমাদের এটাই করা উচিত। আমাদের নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে, উত্তম আচরণ ও কর্ম আমাদের হাত ও পকেটগুলো থেকে উপচে পড়বে, সেগুলোর উপকার যেন আমরা এই দুনিয়ায় পেতে পারি এবং তারপর সেগুলোকে পরকালেও সাথে করে নিয়ে যেতে পারি।

সারসংক্ষেপ

আত্মোন্নয়নের পথে নানা পর্যায় রয়েছে। সর্বপ্রথমে আমাদেরকে অজ্ঞতার সুখনিদ্রা থেকে জাগ্রত হতে হবে এবং আমাদের অস্তিত্বের বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে হবে।

তারপরই আমরা আমাদের সত্তা সম্পর্কে জানতে পারব এবং আমাদের কর্মের ব্যাপারে যত্নশীল হব। এ বিষয়টিকে অবশ্যই প্রকৃত আকীদা-বিশ্বাস এবং এক-অদ্বিতীয় আলাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসের সাথে যুক্ত করতে হবে। উত্তম কর্ম ছাড়া বিশ্বাস পরিপূর্ণ রূপ পায় না। আর তাই নিষিদ্ধ কাজ থেকেও আমাদেরকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। আর সবশেষে, মন্দ বৈশিষ্ট্য ও অভ্যাস থেকে আমাদের আত্মাকে মুক্ত করতে হবে। যদিও এ পথে যাত্রা অত্যন্ত কঠিন, তবুও ইনশাআলাহ্‌ মহান আলাহ্‌র অনুগ্রহে আমরা সেই পর্যায়গুলো সম্পন্ন করার এবং স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁর নৈকট্য অর্জন করার তওফীক লাভ করব।

অনুবাদ : মো. আশিফুর রহমান

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. বিহারচ্ল আনওয়ার, ৫০তম খণ্ড, পৃ. ১৩৪

২. ইরশাদ আল-কুলূব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪

৩. গুরারচ্ল হিকাম, পৃ. ১২০

৪. বিহারচ্ল আনওয়ার, ৫৫তম খণ্ড, পৃ. ৩৯

৫. দৃষ্টান্তের জন্য দেখুন : বিহারচ্ল আনওয়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫

৬. একজন ভালো, দয়ালু ও যত্নশীল ব্যক্তি হওয়া বেহেশত লাভের জন্য যথেষ্ট নয়, আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাসী হতে হবে। যদি কেউ অন্যদের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে উত্তম হয়, কিন্তু ঈমানদার না হয়, তাহলে তার বেহেশতে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। হয়তো সে জাহান্নামে যাবে না অথবা তার শাস্তি লাঘব করা হবে, কিন্তু বেহেশত লাভের কোন পথ নেই। এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টা হিসাবে আলাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন একটি জরচ্রি ও আবশ্যিক বিষয় এবং এটি একটি মৌলিক বিশ্বাস।

৭. নাহজুল বালাগা, প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী নং ১৪৬ (১৫০)

৮. বিহারচ্ল আনওয়ার, ৭৪তম খণ্ড, পৃ. ৮৫

(সূত্র :ম্যাসেজ অব সাকালাইন, ভলিউম ১০, নং ৪)

ধর্মতত্ত্ব

কোরআনের আলোকে
মহান আল্লাহর আরশে সমাসীন হওয়া

নবুওয়াত

ইসলাম ও বহুমাত্রিকতা

ইসলাম ও আধুনিকতাবাদ : একটি পর্যালোচনা

ওয়াহাবি মতবাদের স্বরূপ

কোরআনের আলোকে
মহান আল্লাহর আরশে সমাসীন হওয়া

ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই পবিত্র কোরআনের 'পরম করুণাময় আরশের ওপর সমাসীন'[১] আয়াতসহ যে সকল আয়াতে মহান আল্লাহর আরশে সমাসীন হওয়ার বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে তা নিয়ে বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে। মহান আল্লাহর দৈহিক সত্তায় বিশ্বাসী গোষ্ঠী (مُجَسِّمِه) এ ধরনের আয়াতগুলোতে ব্যবহৃত 'استوى' শব্দটিকে 'আসন গ্রহণ অর্থে' প্রয়োগ করেছে।[২] এমনকি কেউ কেউ সূরা বনি ইসরাঈলের ৭৯ নং আয়াতে বর্ণিত মহানবী (সা.)-কে দেয়া প্রতিশ্রুত 'প্রশংসিতের মর্যাদা' বলতে কিয়ামতের দিন আরশে মহান আল্লাহর পাশে আসন গ্রহণ অর্থ করেছেন।[৩] কিন্তু যারা মহান আল্লাহর বস্তু সত্তার ঊর্ধ্বে হওয়ার ধারণায় বিশ্বাসী– আহলে সুন্নাতের সবচেয়ে বড় দল আশয়ারী এবং ক্ষুদ্র অন্যান্য দল, যেমন মুতাজিলা, মাতিরিদী এবং মহানবী (সা.)-এর আহলে বাইতের অনুসারীদের সকল দল মহান আল্লাহর আরশে সমাসীন হওয়া সম্পর্কিত আয়াতগুলোকে রূপক অর্থে গ্রহণ করেছে এবং 'কোন কিছুই মহান আল্লাহর সদৃশ নয়' আয়াতটিসহ পবিত্র কোরআনের অন্যান্য আয়াতের সাহায্য নিয়ে উল্লিখিত আয়াতকে ভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা করেছে। তারা বলে, আরশে সমাসীন হওয়ার অর্থ বিশ্ব ও সৃষ্টি জগতকে পরিচালনা করা। এ অর্থটি অনুধাবনের জন্য পাঁচটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। যথা :

১. পবিত্র কোরআনে ব্যবহৃত استواء শব্দটির (যা استوى ক্রিয়ামূল থেকে উদ্ভূত) কোরআনগত ও আভিধানিক অর্থ ও ব্যবহার।

---

১. সূরা ত্বহা : ৫।
২. মাজমুআতুর রাসাইলিল কুবরা, পৃ. ২; আল আকীদাতুল ওয়াসিতিয়া, পৃ. ৩৯৯, আল আকীদাতুল হামাভীয়া, পৃ. ৪২৯।
৩. প্রাগুক্ত

২. 'আরশ' (عرش) শব্দটি কোরআনে কী কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

৩. পবিত্র কোরআনে 'মহান আল্লাহ আরশে সমাসীন হলেন' আয়াতটির পূর্বে ও পরে যে বাক্যগুলো ব্যবহৃত হয়েছে তার ভাবার্থ ও তাৎপর্য কী?

৪. ভিন্ন অর্থবাহী ইঙ্গিতমূলক বাক্যে বাহ্যিক ও প্রত্যক্ষ অর্থ মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং পরোক্ষ ও আবশ্যক অর্থই মুখ্য।

৫. 'মহান আল্লাহ কোন কিছুর সদৃশ নন'– আয়াতটির অর্থ।

আমরা যখন এই পাঁচটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করব তখন আলোচ্য আয়াতের প্রকৃত অর্থ আমাদের সামনে স্পষ্ট হবে। 'استوى' এর আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে ইবনে মানযুর বলেছেন : استوى[১] শব্দটি নিম্নোক্ত তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা :

১. পূর্ণতায় পৌঁছা ও বিকশিত হওয়া;

২. জয় ও আধিপত্য লাভ;

৩. ভারসাম্য অর্জন, স্থিতি লাভ।

এ তিনটি অর্থ থেকে বোঝা যায় استوى শব্দটি কখনই جلس বা قعد অর্থাৎ বসল বা আসন গ্রহণ করল অর্থে ব্যবহৃত হয় না। তাই আরবি ভাষায় কাউকে বসতে নির্দেশ দান করতে اِسو শব্দটি ব্যবহার হতে দেখা যায় নি; বরং এ ভাষায় শব্দটি সাধারণত সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, استوى শব্দটি কখনও সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা বোঝাতে, কখনও বিকাশ ও পূর্ণতা লাভ, আবার কখনও প্রতিষ্ঠিত ও আধিপত্য লাভ অর্থে প্রয়োগ হয়ে থাকে।

আখফাশ বলেছেন : استوى অর্থ নিয়ন্ত্রণ লাভ ও প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আরবরা যখন বলে : استويت فوق الدابه– তার অর্থ হলো পশুর ওপর স্থিত হয়েছি ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। যদিও এ ক্ষেত্রে পশুর ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ ও স্থিতি অর্জনের সঙ্গে

১. استواى শব্দটি سوى শব্দ থেকে উদ্ভূত যা আরবি ব্যাকরণের افعال বাবের অন্তর্ভুক্ত। سوى অর্থ সমান।

আরোহণের অপরিহার্য সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু استوى ও আরোহণ সমার্থক নয়। কারণ, প্রকৃত উদ্দেশ্য পশুর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ।[১]

পবিত্র কোরআনে استوى এর ব্যবহার

এখন আমরা দেখব পবিত্র কোরআনে استوى শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। استوى শব্দটি কোরআনে সতের বার এসেছে। তন্মধ্যে সাতবার আল্লাহর আরশের ওপর সমাসীন হওয়া বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এ বাক্যগুলোতে استوى শব্দটি على (ওপর) অব্যয়ের সাথে উল্লিখিত হয়েছে। কিছু আয়াতে استوى শব্দটি الى অব্যয়ের সাথে এবং কিছু আয়াতে কোন অব্যয়ের সঙ্গ ছাড়াই এসেছে। আমরা এ সম্পর্কিত কিছু আয়াত নমুনাস্বরূপ নিম্নে উল্লেখ করছি :

১. কোরআনে হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে :

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيۡنَٰهُ حُكۡمٗا وَعِلۡمٗاۚ

'যখন সে (মূসা) পূর্ণ যৌবনে উপনীত এবং (মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হলো তখন আমরা তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম।' (সূরা ইউসুফ : ২২)

২. সূরা ফাত্হ-এর ২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

...كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ...

'...একটি শস্য ক্ষেতের ন্যায় যা অঙ্কুর নির্গত করে। অতঃপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয়। অতঃপর স্বীয় কা-ের ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়...।'

আয়াতটিতে استوى শব্দটির মাধ্যমে গাছের দৈহিক পূর্ণতা ও বৃদ্ধি ঘটে নিজের মূলের ওপর দাঁড়ানো ও দৃঢ়তা লাভ বুঝানো হয়েছে।

৩. নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তুর ক্ষেত্রে استوى শব্দটি ব্যবহার করে কোরআন বলেছে :

---

১. লিসানুল আরাব, খ- ১৪, পৃ. ৪১৪, سوى শব্দমূলের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

...وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَـٰمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾ لِتَسْتَوُۥا۟ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ ثُمَّ تَذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ ...

'আর তিনি তোমাদের জন্য নৌযান ও গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন যার ওপর তোমরা আরোহণ করে থাক, (তাদের এরূপ করছেন) যেন তোমরা সেগুলোর পিঠে স্থিরভাবে বসতে পার। অতঃপর যখন তাদের ওপর স্থিত হও তখন তোমাদের প্রতিপালকের নেয়ামতকে স্মরণ কর।' (সূরা যুখরুফ : ১২-১৩)

এ আয়াতটিতে প্রথমে জাহাজ, নৌকা এবং চতুষ্পদ জন্তুর ওপর আরোহণের কথা বর্ণিত হয়েছে যেখানে ركب শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অতঃপর استوى শব্দটি এসেছে। এ থেকে বোঝা যায়, নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তুর ওপর আরোহণ এবং استوى দুটি ভিন্ন জিনিস। প্রথমে আরোহণ কর্ম সংঘটিত হয়, তারপর استوى এর বিষয়টি ঘটে।

এ পরম্পরা থেকে আমরা এ বিষয়টি বুঝতে পারি যে, استوى হলো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও স্থিতি লাভ যা বাহনকে উদ্ধত অবস্থা ও নিয়ন্ত্রণহীনতা থেকে বশ্যতার অবস্থায় নিয়ে আসার প্রতি ইঙ্গিত করে। অন্যভাবে বলা যায়, যদিও এ ক্ষেত্রে استوى বা স্থিতি অবস্থায় আনয়নের সঙ্গে বসা ও আরোহণের সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু استوى শব্দটি স্বয়ং উপবেশন শব্দের অর্থ বহন করে না; বরং বাহনকে নিয়ন্ত্রণ ও পশুকে আরোহণের জন্য বশ করার সঙ্গে সম্পর্কিত। এক কথায় বলা যায়, استوى শব্দটি এ ক্ষেত্রে বাহনকে নিজের পূর্ণ অধীনে আনা ও তার ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ অর্থের সাথে অধিক সঙ্গতিশীল। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে নূহ (আ.)-এর মহা প্লাবনের ঘটনায় বলা হয়েছে :

وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِىِّ

'এবং পানি শুকিয়ে দেয়া হলো। কাজের সমাধা করা হলো এবং নৌকা জুদী পাহাড়ে স্থিত হলো।' (সূরা হুদ : ৪৪)

এ আয়াতে নিঃসন্দেহে استوى শব্দ দ্বারা নৌকা পাহাড়ে বসা ও আসন গ্রহণ বোঝানো হয়নি; বরং যেহেতু নৌকা প্লাবনের পানিতে দুলছিল, সেহেতু যখন জুদী পর্বতের

চূড়ায় ভিড়ল ও নোঙ্গর ফেলল তখন দোলন অবস্থা থেকে স্থিতি লাভ করল। আভিধানিকদের বক্তব্য এবং উল্লিখিত আয়াতগুলোর আলোকে বলা যায়, আরবি ভাষায় কখনও استوى শব্দটি قعد (বসা) جلس (আসন গ্রহণ) বা ركب (আরোহণ)-এর সমার্থক নয় এবং কখনও এ তিনটি শব্দের স্থলাভিষিক্ত হয় না। তবে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে استوى কর্মটি বাস্তব রূপ লাভের জন্য আসন গ্রহণ, বসা ও আরোহণের প্রয়োজন। কিন্তু এ শব্দটির প্রকৃত অর্থ পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ, আধিপত্য লাভ এবং স্থিতি প্রতিষ্ঠা।

পবিত্র কোরআনে 'আরশ' শব্দের ব্যবহার

কোরআনে তিনটি কাছাকাছি অর্থের শব্দ বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা :

১. سرير : على سرر متقالين (বেহেশতবাসীরা) সামনাসামনি আসনে বসে থাকবে।[১]

২. مُتَّكِئِينَ فيها عَلَى الْأَرائِكِ لا يَرَوْنَ فيها شَمْساً وَ لا زَمْهَريرا: أَرائِكِ অর্থাৎ তারা সেখানে পালঙ্কের ওপর হেলান দিয়ে বসবে, সেখানে তারা না প্রখর রোদ অনুভব করবে আর না প্রচ- শীত।[২]

এ দু'টি আয়াতে দেখা যায় سرير ও أَرائِكِ শব্দ দু'টি মানুষের বসার জন্য প্রস্তুত আসনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই দুটি শব্দ প্রতাপ, প্রতিপত্তি ও আধিপত্যের কোন চিহ্ন বহন করে না। কোরআনে যেখানেই এমন আসনের কথা বলা হয়েছে– যার ওপর মানুষ বিশ্রাম অথবা আরাম-আয়েশের জন্য বসে, সেখানে উল্লিখিত দু'টি শব্দের যে কোন একটি ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. عرش শব্দটি যে কোন আসনের জন্য পবিত্র কোরআনে ব্যবহৃত হয়নি; বরং এমন আসনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে যার ওপর বসা ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও আধিপত্যের নিদর্শন। এরূপ কিছু আয়াত এখানে আমরা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করছি। কোরআন ইউসুফ (আ.)-এর পিতা-মাতার মিশরে

১. সূরা হিজর : ৪৭।
২. সূরা দাহর : ১৩।

আগমনের ঘটনায় যখন তাঁরা তাঁর প্রাসাদে প্রবেশ করেন এবং তিনি তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, তা এভাবে বর্ণনা করেছে :

فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ

'যখন তারা ইউসুফের নিকট আসল, সে তার পিতা-মাতাকে তার কাছে সম্মানজনক স্থান দিল এবং বলল : আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী তোমরা শান্তিতে মিশরে প্রবেশ কর। এবং সে তার পিতা-মাতাকে সিংহাসনের ওপর বসাল।' (সূরা ইউসুফ : ১০০)

নিঃসন্দেহে এ আয়াতে 'আরশ' বলতে হযরত ইউসুফ (আ.) সাধারণত যেখানে বসতেন সে আসন অথবা যে বিছানায় ঘুমাতেন তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়নি। বরং নির্দিষ্ট একটি আসন যাতে বসে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন এবং তাঁর ক্ষমতার নিদর্শন বলে গণ্য হতো তা বোঝানো হয়েছে।

সাবার রাণী বিলকিসের রাজত্বের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে :

...وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

'তাকে সবকিছু দেয়া হয়েছে এবং তার একটি বড় সিংহাসন আছে।' (সূরা নাম্‌ল : ২৩)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

قَالَ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُاْ أَيُّكُمْ يَأْتِينِى بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾

[হযরত সুলাইমান (সভাসদদের উদ্দেশে)] বলল, তোমাদের মধ্যে কে তার আত্মসমর্পিত হয়ে আমার নিকট আগমনের পূর্বেই তার সিংহাসন আমার সামনে নিয়ে আসবে?' (সূরা নাম্‌ল : ৩৮)

মহান আল্লাহর সঙ্গে কোন উপাস্যের বিদ্যমানতাকে অসম্ভব বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُۥٓ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّٱبْتَغَوْاْ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾

"তুমি বল : 'যদি তাঁর সাথে, যেমন তারা বলে, আরও উপাস্য থাকত সেক্ষেত্রে অবশ্যই তারা আরশের অধিপতির নিকট পৌঁছবার পথ খুঁজত' ।" (বনি ইসরাঈল : ৪২)

এ আয়াতটিতে যে বলা হয়েছে, 'আরশের অধিপতির নিকট পৌঁছবার পথ খুঁজত', এর অর্থ তাঁর আরশ দখলের জন্য চেষ্টা চালাত । নিঃসন্দেহে আরশ দখলের অর্থ এটা নয় যে, বিশেষ কোন আসন অধিকারের জন্য তারা প্রচেষ্টা চালাবে; বরং উদ্দেশ্য হলো বিশ্বজগতের কর্তৃত্ব হস্তগত করার জন্য তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতো । সুতরাং আয়াতে ذِى ٱلْعَرْشِ বলতে সৃষ্টিজগতের পরিচালক বোঝানো হয়েছে ।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, যখন কোন বক্তা আসন গ্রহণ ও উপবেশনের অর্থ বোঝাতে চান তখন আরবিতে سرير ও أَرائِكِ শব্দ দু'টি ব্যবহার করেন । কিন্তু যখন পরিচালনার দায়িত্ব পালনের জন্য যে আসনে বসা হয় অর্থাৎ যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির নিদর্শন তা বোঝানো হয়, তখন আরশ শব্দটি ব্যবহৃত হয় । এ বিষয়টি হযরত ইউসুফ (আ.) ও রাণী বিলকিস সম্পর্কিত আয়াত দু'টি থেকে স্পষ্ট হয় । কারণ, যে আসনের উল্লেখ আয়াত দু'টিতে করা হয়েছে তা তাঁদের ক্ষমতার প্রতীক যাতে বসে তাঁরা রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন । আর যে আয়াতটিতে আল্লাহকে 'আরশের অধিপতি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে তার অর্থও কখনও বসার আসন নয়; বরং এতে 'আরশ' শব্দটি রূপক অর্থে ক্ষমতার কেন্দ্র নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়েছে ।

আরবি ভাষায়ও 'আরশ' শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয় । যেমন বলা হয়ে থাকে : ثلّ عرشُ الملک , এর অর্থ রাজার সিংহাসনের পতন হয়েছে । অথবা ثلّ الله عرشهم অর্থ আল্লাহ তাদের রাজ্য ও ক্ষমতার পতন ঘটান ।[১]

সুতরাং 'আরশ' শব্দটি সার্বিকভাবে রাজা বা সম্রাটের বসার আসন নয়; বরং প্রকৃত অর্থে তা ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির নিদর্শন ।

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে আমরা দু'টি সিদ্ধান্তে গ্রহণ করতে পারি ।

---

১. ইবনে মানজুর, লিসানুল আরাব, ১১তম খ-, পৃ. ৮৯ ।

প্রথমত, استوى শব্দটি আরবি ভাষার جلس বা আসন গ্রহণ শব্দের সমার্থক নয়। বরং তার থেকে ভিন্ন এক অর্থ যার সঙ্গে আধিপত্য, ক্ষমতা ও স্থায়িত্ব লাভের বিষয় সংযুক্ত। যেমন আরবি কবিতায় এসেছে :

قد استوى بشر على العراق من غير سيف و دم مهراق

অর্থাৎ (আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের ভাই) বাশার কোনরূপ রক্তপাত ছাড়াই ইরাকের ওপর আধিপত্য কায়েম করল (ও শাসনক্ষমতা হস্তগত করল)।[১]

দ্বিতীয়ত, 'আরশ' শব্দটি পবিত্র কোরআনে শাব্দিক অর্থে (অর্থাৎ 'বসার বা আসন গ্রহণের স্থান' অর্থে) ব্যবহৃত হয়নি; বরং যে আসনটি ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির নিদর্শন ও শক্তির প্রকাশক তাকে নির্দেশ করে।

তৃতীয়ত, যে বিষয়টি এখানে আমরা পর্যালোচনা করব তা হলো ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش আয়াতাংশটির পূর্ব ও পরে যে বাক্যগুলো এসেছে। এ আয়াতাংশটি সাতটি সূরায় এসেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ বাক্যাংশের পূর্বে অথবা পরে মহান আল্লাহ কর্তৃক বিশ্বজগৎ পরিচালনা ও সৃষ্টির ব্যবস্থাপনার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এখানে আমরা চারটি আয়াতের উল্লেখ করছি :

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٥٤﴾

'তোমাদের প্রতিপালক হলেন সেই আল্লাহ যিনি আকাশম-লী ও পৃথিবীকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে সমাসীন হলেন। তিনি দিনকে রাত দিয়ে আবৃত করেন এবং রাত দিনের পেছনে ধাবমান। চন্দ্র ও তারকা রাশি তাঁর নির্দেশের অনুগত। জেনে রাখ, সৃষ্টি ও পরিচালনা তাঁরই (অধীনে)। বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ মহা কল্যাণময়।' (সূরা আরাফ : ৫৪)

১. ইবনে কাসির, আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯ম খ-, পৃ. ৯।

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ إِذْنِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾

'নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক হলেন আল্লাহ যিনি আকাশ ম-লী ও পৃথিবীকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। তিনি (বিশ্বজগতের) কর্ম পরিচালনা করছেন। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন শাফায়াতই (সুপারিশ) নেই। তিনি হলেন তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তোমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করবে না।' (সূরা ইউনূস : ৩)

(৩)الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَي الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا

'সেই সত্তা যিনি আকাশম-লী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মাঝে যা আছে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরম করুণাময়, নিবিষ্ট চিত্তে তাঁর কাছে প্রশ্ন কর এ জন্য যে, তিনি সর্বজ্ঞাতা।'

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

'তিনিই সেই সত্তা যিনি আকাশম-লী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হলেন। যা কিছু পৃথিবরি মধ্যে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তার থেকে বের হয় এবং যা কিছু আকাশ থেকে বর্ষিত (অবতীর্ণ) হয় ও যা কিছু ঊর্ধ্বে গমন করে তা তিনি অবহিত। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।' (সূরা হাদীদ : ৪)

চতুর্থত, এ পর্যায়ে আমরা প্রবন্ধের শুরুতে যে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করেছি তার চতুর্থটির প্রতি ইশারা করব। আর তা হলো ইঙ্গিতমূলক বাক্যে শাব্দিক অর্থ মূল লক্ষ্য

নয়। বরং শব্দের অন্তরালে যে আবশ্যক অর্থ রয়েছে তা-ই লক্ষ্য। সাহিত্যিক ও ব্যাকরণবিদদের মতে ইঙ্গিতসূচক বাক্যে যে ইঙ্গিতবাহী শব্দমালাকে ব্যবহার করা হয় তা কারণের স্থলাভিষিক্ত, কিন্তু তার মাধ্যমে ফলাফলের অর্থই উদ্দেশ্য থাকে। যেমন আরবি ভাষায় যখন বলা হয় «يداه مغلولة» বা তার হাত বাঁধা, এর অর্থ হলো সে কৃপণ বা দানশীল নয়। কিংবা যদি বলা হয় «كان بابُه مفتوحة» বা তার দ্বার ছিল উন্মুক্ত', এর অর্থ হলো সে অতিথিপরায়ণ। পাঠক লক্ষ্য করেছেন, এখানে প্রত্যক্ষ অর্থ, যেমন 'হাত বাঁধা থাকা' বা 'দ্বার উন্মুক্ত থাকা' বোঝানো মূল উদ্দেশ্য নয়। কারণ, বাস্তব দৃষ্টিতে তার হাত আদৌ বাঁধা নয় এবং অতিথিপরায়ণ ব্যক্তির দরজাও সবসময় খোলা থাকে– এমন নয়। বরং এর পরোক্ষ ও আবশ্যক অর্থই ইঙ্গিতসূচক বাক্যে উল্লিখিত হয়েছে।

অতএব, আমরা নিম্নোক্ত চারটি বিষয় এখানে ব্যাখ্যা করলাম :

প্রথমত 'استوى' শব্দটি 'جلوس' বা বসা অর্থের প্রতিশব্দ নয়; বরং এর প্রকৃত অর্থ স্থিতি লাভ, আধিপত্য স্থাপন ও ক্ষমতা গ্রহণ।

দ্বিতীয়ত 'عرش' শব্দটিও আরবিতে ' سرير ' (আসন) বা 'أَرائِكِ' আরাম কেদারা বা পালঙ্ক শব্দের প্রতিশব্দ নয়; বরং বিশেষ ধরনের আসন যাতে সম্রাট বা রাজা বা প্রধানমন্ত্রী বসেন এবং সেখানে বসে রাজ্যের কর্মকা- পরিচালনা করেন। তাই শাব্দিক অর্থে 'عرش' সিংহাসন বা মসনদ বলা যেতে পারে। তদুপরি পবিত্র কোরআনে একটি আয়াতে (« ذى العرش» কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী) 'আরশ' শব্দটি আল্লাহর ক্ষেত্রে রূপক অর্থে এসেছে।

তৃতীয়ত পবিত্র কোরআনে (আরবি বাক্য রয়েছে) আয়াতাংশের পূর্বে ও পরে সাধারণত বিশ্ব ও সৃষ্টিজগৎ পরিচালনার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে, যেমন আকাশম-লী ও পৃথিবী সৃষ্টি, দিবা রাত্র সৃষ্টি, চন্দ্র ও তারকারাশি ইত্যাদির আবর্তন।

চতুর্থত, كنايه বা ইঙ্গিতসূচক বাক্যে প্রত্যক্ষ অর্থ মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং পরোক্ষ ও নিহিত অর্থ যা আবশ্যক পরিণতি নির্দেশ করে, তা-ই উদ্দেশ্য।

উপরিউক্ত চারটি বিষয় থেকে আমরা যে সিদ্ধান্তে পৌছি তা হলো :

ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ 'অতঃপর তিনি আরশের ওপর সমাসীন হলেন' বাক্যটিতে মহান আল্লাহ যে বিশ্বজগতের পরিচালনা কর্মে নিয়োজিত আছেন তার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ 'আরশ' এখানে শক্তি ও ক্ষমতার প্রতীক, যেহেতু এরূপ আসনে বসেই প্রতিপত্তির সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করা হয়। তাই তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ– যা সৃষ্টি ও বিশ্বজগতকে পরিচালনার

কারণ বলে বিবেচিত। যেহেতু পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা না হলে পরিচালনা কর্ম সম্ভব হয় না। তিনি কখনোই বিশ্বজগত সৃষ্টির পর একে পরিচালনার দায়িত্ব স্বাধীনভাবে কারো ওপর ছেড়ে দেননি। মহান আল্লাহ যে পবিত্র কোরআনে ফেরেশতাদের فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرًا বা 'বিষয়সমূহের পরিচালক' বলে পরিচিত করিয়েছেন তাঁরা কখনই তাঁর থেকে স্বাধীন নন; বরং তাঁর অনুমতিক্রমে সকল বিষয় পরিচালনা করেন। কখনই তা মূর্তিপূজক বা মুশরিকদের (مشرک) ধারণার মতো নয় যারা মনে করে যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কাউকে স্বাধীনভাবে বিশ্বজগৎ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন অথবা তাদের মধ্যে কাজ বণ্টন করে দিয়ে নিজে (নাউজুবিল্লাহ) বিশ্রাম গ্রহণ করছেন। এরূপ বিষয় সম্পূর্ণ অসম্ভব যে, কোন সৃষ্টি আল্লাহর থেকে স্বাধীন হয়ে কোন দায়িত্ব পালন করতে পারে। কারণ, সকল সৃষ্টি সত্তাগতভাবে আল্লাহর মুখাপেক্ষী এবং এক মহূর্তের জন্যও তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আমাদের এ দিকটি চিন্তা করে দেখতে হবে যে, কেন আল্লাহ (جلس علی السریر) 'তিনি আসনের ওপর বসলেন' অথবা (اتّکی علی الاریکة) 'পালঙ্কের ওপর হেলান দিলেন'– এ ধরনের বাক্যাবলি ব্যবহার করেননি। যদি আসন গ্রহণই উদ্দেশ্য হতো, তবে ঐ রূপ বলাই উপযুক্ত হতো। কিন্তু যখন আমরা দেখছি তিনি 'استوی' এবং 'عرش' শব্দ দু'টি ব্যবহার করছেন। তারপর বিশ্বজগৎ সৃষ্টির ও পরিচালনার বিষয় উপস্থাপন করছেন, তা থেকে বোঝা যায় এর উদ্দেশ্য শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থ নয়। কখনই এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, মহান আল্লাহর জন্য সৃষ্টি জগতের বাইরে দৃশ্যমান ও বিশাল কিন্তু নির্দিষ্ট আকারের আসন রয়েছে যার ওপর বসে তিনি জগতসমূহকে পরিচালনা করেন। বরং বাক্যটি বিশ্বজগৎ পরিচালনার দায়িত্ব পালনের প্রতি ইঙ্গিত করছে। কিরূপে সম্ভব যে وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطاً[১] মহান আল্লাহ সকল কিছুকে বেষ্টন করে আছেন (এবং اَلَا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ[২] জেনে রাখ তিনি সকল কিছুকে বেষ্টন করে আছেন);যিনি সকল স্থানে বিরাজমান (وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنتُمْ তোমরা যেখানেই থাকনা কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন)[৩] এবং তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও (গোপন পরামর্শ) হয় না যাতে ষষ্ঠ জন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। তারা (সংখ্যায়) এর চেয়ে কম হোক বা বেশী হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন।

১. সূরা নিসা : ১২৬।
২. সূরা হামীম সিজদা : ৫৪।
৩. সূরা হাদীদ : ৪।

‘আল্লাহ মহা আরশের অধিপতি’ অর্থ কি?

اللَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ-এ আয়াতটিতে মহান আল্লাহকে মহাআরশের প্রভু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা পূর্বে যা আলোচনা করেছি তা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, মহান আল্লাহর আরশ কোন বস্তুগত উপকরণে প্রস্তুত সিংহাসন নয়; বরং নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির সাথে বিশ্বজগতকে পরিচালনা করা। অন্যভাবে বলা যায়, বিশ্বজগতে অগণিত ও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটছে যেগুলোর প্রত্যেকটির নিকটবর্তী ও সংযুক্ত কারণ রয়েছে। এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণ পরস্পর সুশৃঙ্খলভাবে সংযুক্ত এবং তা সম্মিলিতভাবে সঠিক ও চূড়ান্ত এক কারণে গিয়ে পরিসমাপ্ত হয়। আর এই চূড়ান্ত কারণ হলেন মহান আল্লাহ যিনি এ সকল কারণকে বেষ্টন করে আছেন এবং প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে তাঁর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি পূর্ণ মাত্রায় কার্যকর। সুতরাং বিশ্বজগতের যে বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে এবং এ পর্যায়গুলোর মধ্যে যে বৈচিত্র্য ও পার্থক্য রয়েছে তার সবগুলো একটি পর্যায়ে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সকল ঘটনা ও কারণ তার থেকে উদ্ভূত ও সৃষ্ট হয়। কার্য ও কারণসমূহের ধারা ও পর্যায় ঐ কেন্দ্র থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয় আর এ কেন্দ্রই পবিত্র কোরআনে ‘আরশ’ বলে অভিহিত হয়েছে। এ কারণে যে, সৃষ্টি জগতের সকল বিষয়ের উৎস ও ভা-ার সেখানেই রয়েছে এবং নির্দেশ সেখান থেকে জারি হয়। সমগ্র আকাশম-লী ও পৃথিবী যেহেতু এ কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই একে ‘মহা আরশ’ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সুতরাং বিশ্বজগতের বস্তুগত ও অবস্তুগত (দৃশ্যজগত ও অদৃশ্যজগত) কারণসমূহের ধারা একটি কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হয়। এ কেন্দ্রটি সৃষ্টি জগতের সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা প্রতিফলিত হয়। আর আরশের চারিদিকের যে ফেরেশতাদের কথা কোরআন বলেছে, তাঁরা হলেন সেই দল যাঁরা সৃষ্টি জগতে বিভিন্ন কার্যের দায়িত্ব পালন করেন অর্থাৎ ঐ কেন্দ্র থেকে যে নির্দেশ জারি হয়, তাঁরা আকাশম-লী ও পৃথিবীতে তা কার্যকর করেন।

এ ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থও আমাদের সামনে স্পষ্ট হয় :

ٱلَّذِينَ يَحۡمِلُونَ ٱلۡعَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَيُؤۡمِنُونَ بِهِۦ وَيَسۡتَغۡفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعۡتَ كُلَّ شَيۡءٖ رَّحۡمَةٗ وَعِلۡمٗا فَٱغۡفِرۡ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمۡ عَذَابَ ٱلۡجَحِيمِ ٧

"যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চারপাশ ঘিরে আছে তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। আর মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে : 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব, যারা তওবা করে ও আপনার পথ অবলম্বন করে আপনি তাদের ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।" (সূরা মুমিন : ৭)

'মহান আল্লাহ কোন কিছুর সদৃশ নন'– আয়াতটির অর্থ

পবিত্র কোরআন মহান আল্লাহকে এমন এক সত্তা বলে পরিচয় করিয়েছে যিনি কোন কিছুর সদৃশ নন। আল্লাহ বলেছেন : 'কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।'

প্রকৃতপক্ষে এ বাক্যটি মহান আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে মৌলিকতম (ভিত্তিগত) জ্ঞান। যদি এ আয়াতটিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা না হয়, তবে তাঁর কোন গুণকেই চেনা সম্ভব নয়। কারণ, আল্লাহর পরিচিতির পথে সবচেয়ে বিপজ্জনক যে গর্তটি রয়েছে তা হলো তাঁকে তাঁর সৃষ্টির অনুরূপ মনে করা। কারণ, এটি তাকে শির্কের ভয়ঙ্কর গহ্বরে ফেলে দেয়। মহান আল্লাহ এমন এক সত্তা যিনি সকল দৃষ্টিতে অসীম। আর তিনি ব্যতীত যা কিছু রয়েছে তা সসীম। এ কারণেই কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি জীবন, আয়ু, শক্তি ও ক্ষমতা, জ্ঞান, ইচ্ছা শক্তিসহ সকল বৈশিষ্ট্যে অসীমত্বের অধিকারী। এটি অন্য সকল অস্তিত্বের অপূর্ণতা থেকে তাঁকে মুক্ত রেখেছে। 'সুবহান আল্লাহ' শব্দটির অর্থও হলো আল্লাহকে সকল ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে পবিত্র ঘোষণা করা। এ কারণেই অনেক বিষয়ই– যা অন্যদের জন্য প্রযোজ্য, তাঁর জন্য প্রয়োজন নয়। যেমন আমাদের জন্য কোন কাজ সহজ, কোন কাজ কঠিন, কোন কিছু আমাদের নিকটে রয়েছে, আবার অসংখ্য ও অগণিত বস্তু আমাদের থেকে দূরে অবস্থান করছে।[১] অনেক ঘটনা আমাদের জন্য অতীত, অনেক ঘটনা বর্তমান বা ভবিষ্যৎ। অনেক বস্তু আমাদের থেকে ক্ষুদ্র, অনেক বস্তু আমাদের থেকে বড়। কারণ, যেহেতু আমরা সীমিত সত্তা তাই অন্য বস্তু ও ধারণার সাথে

১. কিন্তু মহান আল্লাহ বলেছেন : 'আমরা তার শাহরগ হতেও তার নিকটে অবস্থান করছি।' (কাফ : ১৬) এবং 'যখন আমার বান্দারা প্রশ্ন করে (তাদের বল :) আমি নিকটেই আছি এবং তার আহ্বানকে শুনি।' সুতরাং মহান আল্লাহ কারো থেকে কাছে, আবার কারো থেকে দূরেও নন। সকলের নিকটে থাকার কারণে তিনি একই মুহূর্তে তাদের সকলের দোয়া শুনেন ও জবাব দেন। এটা তাঁর সর্বত্র বিরাজমান থাকার দলিল।

তুলনা করে আমরা নিজেদের অবস্থান যাচাই করে দেখি। কিন্তু এমন সত্তা যিনি অনন্ত ও অসীমতার জন্য নিকট-দূর, কঠিন-সহজ, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ইত্যাদি অর্থহীন কারণ তাঁর জন্য সবই নিকটে, সবই সহজ এবং সবই বর্তমান। 'কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়'– আয়াতটি কখনই এ বিষয়টি বলার জন্য অবতীর্ণ হয়নি যে, কোন বস্তুর সঙ্গে আল্লাহর একশ ভাগ মিল নেই, কিন্তু এক ভাগ বা দশ ভাগ মিল রয়েছে। কারণ, পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যা অপরটির সাথে এক ভাগ সদৃশ ও অনুরূপ। তাই আয়াতটি তাঁর সঙ্গে অপর কোন বস্তুর বিন্দুমাত্র সদৃশতা প্রত্যাখ্যান করতেই অবতীর্ণ হয়েছে। কোন কিছুর সদৃশ না হওয়া এবং আল্লাহর অসীমতার ও দলিলসমূহ তাঁর বিশেষ স্থানে অবস্থানকে প্রত্যাখ্যান করে। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় ثمّ استوى على العرش আয়াতটি রূপক অর্থে এসেছে। কোন অবস্থাতেই একে বস্তুগত অর্থে গ্রহণ করা যায় না। মহান আল্লাহর দৈহিক সত্তা হওয়ার দাবি তাঁর অসীমতার পরিপন্থী এবং তা الله اكبر অর্থাৎ মহান আল্লাহর সকল কিছুর ঊর্ধ্বে ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার ইসলামের চিরন্তন স্লোগানকে প্রত্যাখ্যান করে। তাছাড়াও এটি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে স্বতঃসিদ্ধ একটি বিষয় যে, কোন সীমিত সত্তাই অসীম ও অনন্ত জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। তেমনি অসীম কোন সত্তাকে সীমিত কোন আসন ধারণ করতে পারে না।[১]

অতএব, যারা আয়াতটিকে বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করে তারা প্রকৃতপক্ষে কোরআনের অন্যান্য স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আয়াত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলকে প্রত্যাখ্যান করে। আর তাই ثمّ استوى على العرش আয়াতকে মহান আল্লাহর বিশ্বজগৎ পরিচালনা কর্মে নিয়োজিত হওয়া অর্থ করাই বাঞ্ছনীয়।

১. যদি কেউ বলে, আল্লাহ তাঁর অসীম ক্ষমতার বলে ইচ্ছা করলে একটি মাছির পাখার ওপর তাঁর সিংহাসন বসাতে ও তার ওপর আরোহণ করতে পারেন, তবে তাকে বলতে হয়, মহান আল্লাহ সকল সত্তাগত অসম্ভব কাজ করতে পারেন, এমনকি অপর এক খোদাও তৈরি করতে পারেন যে তাঁর সমান অথবা তাঁর থেকেও শক্তিশালী হবে।

নবুওয়াত

মানবজাতিকে হেদায়েত ও সঠিক পথে পরিচালনা করার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আমরা জানি প্রজ্ঞাবান আল্লাহর কোন কাজই প্রজ্ঞাহীন নয় অর্থাৎ তিনি কোনকিছুই উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য এমন নয় যে, তারা পৃথিবীতে কিছুদিন বসবাস করে এক সময় মৃত্যুবরণ করবে। বরং মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে সে যেন ভাল ও মন্দ বিষয়গুলো জেনে ভালকে গ্রহণ করে ও মন্দকে বর্জন করে পার্থিব জীবনে পূর্ণতা অর্জন করে এবং পরকালীন জীবনেও সফলতা লাভ করে।

যেহেতু মানুষের জানার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং অনেক বিষয়ই বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে পরিপূর্ণভাবে বোঝা সম্ভব নয় সেহেতু তার জন্য ঐশী পথনির্দেশকের প্রয়োজন রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সে কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে, কোথায় যাবে- এ বিষয়গুলো স্বতন্ত্রভাবে বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির এ সীমাবদ্ধতা কেবল সৃষ্টিসূচনা ও পরকাল বিষয়েই নয়; বরং জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই সে সুনির্দিষ্ট কোন পথ নির্বাচন করতে পারেনি।

আবার মানুষ তার কল্যাণ-অকল্যাণের বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি জানে না। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পার্থিব ও বস্তুগত কল্যাণ-অকল্যাণকে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত চিহ্নিত করা গেলেও আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক কল্যাণের বিষয়াদি ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নির্ধারণযোগ্য নয়। তদনুরূপ ঐগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন ও পার্থিব কল্যাণের সাথে বিরোধপূর্ণ অবস্থায় অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি শনাক্তকরণও সম্ভব নয়। তাই কোন্ বিষয়ে তার কল্যাণ ও কোন্ বিষয়ে তার অকল্যাণ এটা জানানোর জন্যই নবী প্রেরণের প্রয়োজন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় মানবসৃষ্টির পশ্চাতে বিদ্যমান উদ্দেশ্য তখনই বাস্তবায়িত হবে যখন জীবনের বাস্তবতা এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তি ভিন্ন অপর একটি মাধ্যমের অস্তিত্ব থাকবে।

আর সেটাই হলো ওহী। যাঁদের কাছে মহান আল্লাহ এ ওহী প্রেরণ করেন তাঁদেরকে বলা হয় নবী।

আল্লাহতায়ালার জ্ঞান, যে জ্ঞান সকল প্রকার দোষ ত্রুটি এবং বিভ্রান্তি হতে মুক্ত, সেই জ্ঞানেরই কিছুটা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে নবীরা এ পৃথিবীতে এসেছিলেন। মানুষকে তারা সেসব জ্ঞান শিক্ষা দিতে এসেছিলেন যা তাঁদের সাহায্য ছাড়া মানুষের পক্ষে শিক্ষা করা সম্ভব ছিল না।

নবী-রাসূলগণ ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের পথ সম্পর্কে মানুষকে জ্ঞান দেন, তাদের প্রশ্নের জবাব দেন, তাদেরকে পূর্ণতার পথে পৌঁছতে সাহায্য করেন।

মানব সম্প্রদায়ের প্রথম ব্যক্তিও আল্লাহর নবী ছিলেন যাতে জীবনের সঠিক কর্মসূচী সম্পর্কে তিনি পরিচিতি লাভ করতে পারেন এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্বয়ং তাঁর ক্ষেত্রেও বাস্তবায়িত হয়। এরপর তাঁর মাধ্যমে অন্যান্য মানুষও হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়।

যারা মনে করে বুদ্ধিবৃত্তিক পথনির্দেশনা ঐশী পথনির্দেশনার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে তাদের জন্য নিম্নের দু'টি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন :

১. মানুষ নিজের পরিচয় সম্পূর্ণভাবে শনাক্তকরণে সক্ষম নয়, একমাত্র মহান আল্লাহই মানুষের পরিচয় সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত;

২. মানুষ তার সত্তাপ্রেমী প্রবণতার কারণে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সবসময় ব্যক্তিগত লাভের পেছনে ধাবিত হয় এবং পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে সে তার ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থকে পরিপূর্ণভাবে এড়িয়ে যেতে পারে না। কিন্তু নবিগণের পরিকল্পনা যেহেতু মহান আল্লাহর পক্ষ হয়ে থাকে, তাই সেগুলো এ ধরনের ত্রুটি থেকে মুক্ত।

তাই বলা যায়, মানুষ সবসময়ই ঐশী পথনির্দেশের মুখাপেক্ষী থেকেছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য

১. মহান আল্লাহর দিকে আহ্বান : বিভিন্ন কারণে মানুষের মধ্যে বিচ্যুতি প্রবেশ করে এবং এক আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে নানা কিছুর ইবাদত শুরু করে। নবিগণ আল্লাহর পরিচয় জানানোর মাধ্যমে একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য মানুষকে

আহ্বান করেন এবং অন্য সকল উপাস্যের উপাসনা করা থেকে বিরত থাকতে বলেন।

২. অবগত করানো : যেহেতু পৃথিবীর কর্মকা-ের ভিত্তিতে মানুষের প্রতিদান দেয়া হবে সেহেতু যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণের বিষয় তাঁর সামনে উপস্থাপিত হওয়া উচিত যাতে সে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। মহান আল্লাহ নবীদের মাধ্যমে কল্যাণ ও অকল্যাণের বিষয়গুলো জানিয়ে দেন যাতে সে কিয়ামতের দিন তাঁর বিরুদ্ধে কোন অজুহাত দাঁড় করাতে না পারে যে, সে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত ছিল না।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ

'আমি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে রাসূল প্রেরণ করেছি যাতে রাসূলের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অজুহাত না থাকে।'– সূরা নিসা : ১৬৫

৩. স্মরণ করিয়ে দেয়া : এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি অনুধাবন করতে সক্ষম। কিন্তু বস্তুগত বিষয়াদির প্রতি গুরুত্বারোপ ও পাশবিক প্রবৃত্তির আধিক্যের কারণে এগুলো সম্পর্কে বিস্মৃত হয় অথবা কুশিক্ষা ও অপপ্রচারের কারণে সেগুলো চাপা পড়ে যায়। নবিগণ এসব বিস্মৃত বিষয়কে স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে তাদের মানবীয় সত্তার প্রকৃত পরিচিতি তাদের সামনে তুলে ধরেন।

৪. আচরণগত আদর্শ সৃষ্টি : মানুষের পরিচর্যা, বিকাশ ও উৎকর্ষের ক্ষেত্রে আচরণগত আদর্শের অস্তিত্ব হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী। মহান নবিগণ মানুষকে বিভিন্নমুখী জ্ঞান দান করা ছাড়াও তাদেরকে আত্মশুদ্ধি অর্জনের পথ সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন ও প্রশিক্ষণ দান করেন।

মহান আল্লাহ কর্তৃক নবী প্রেরণের কারণ সম্পর্কে হযরত আলী (আ.) বলেন : 'মানুষের প্রকৃত সত্তা যে পর্দার আড়ালে চাপা পড়ে আছে সেই পর্দাকে উন্মোচিত করে দেবার জন্যই আল্লাহ তা'আলা নবীদেরকে পাঠিয়েছেন। পাঠিয়েছেন মানুষের মধ্যে লুক্কায়িত চিন্তাসম্পদকে উন্মোচিত করার জন্য।' তিনি আরও বলেন : 'যখন সাধারণ মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়েছিল, আল্লাহকে ভুলে

গিয়েছিল, অন্য অনেক কিছুকে আল্লাহ জ্ঞানে পূজা আরম্ভ করেছিল এবং শয়তান সাধারণ মানুষকে তাদের প্রকৃত সহজাত প্রবৃত্তি ও বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং আল্লাহর বন্দেগী থেকে নিরত করেছিল তখন আল্লাহ তা'আলা নবীদেরকে প্রেরণ করলেন। নবীরা তখন মানুষের মধ্যে একের পর আবির্ভূত হলেন। তাঁরা এলেন মানুষ তার আত্মার যে সম্পদকে হারিয়ে ফেলেছিল সেই সম্পদের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে যে প্রতিশ্রুতি মানুষ করেছিল সেই প্রতিশ্রুতির কথা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে, মানুষকে আল্লাহ যে সম্পদ ও বিভা দান করেছেন কিন্তু যেগুলো সুপ্ত রয়েছে সেগুলোকে জাগিয়ে তুলতে।'– নাহজুল বালাগাহ, খুতবা নং ১

নবীর বৈশিষ্ট্য

নিষ্পাপত্ব : নবীকে নিষ্পাপ হতে হবে। ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত যে কোন প্রকার গুনাহ ও ভুলভ্রান্তি থেকে নবীগণকে পবিত্র হতে হবে।

জ্ঞান : নবীকে যেহেতু পার্থিব ও পারলৌকিক মুক্তির যাবতীয় বিষয়ে মানুষকে হেদায়েত করতে হয় সেহেতু তাঁকে এসব বিষয় সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত হতে হবে।

নিষ্পাপত্বের দলিল : নবিগণের পবিত্রতার সপক্ষে যে সব দলিলের অবতারণা করা হয় তা দু'ধরনের। বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল ও উদ্ধৃতিগত দলিল।

১. বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল : প্রথমত নবীদের এজন্যই প্রেরণ করা হয়েছে যাতে তাঁরা মানবজাতিকে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সঠিকভাবে সম্পন্ন করার শিক্ষা দেন। যদি তাঁরাই তাঁদের শিক্ষার বিপরীত কাজ করেন তবে জনগণ তাঁদের ওপর আস্থা রাখতে পারবে না। এর ফলে নবুওয়াতের উদ্দেশ্যই বাস্তবায়িত হবে না। তাই নবিগণ হবেন পবিত্র ও নিষ্পাপ ব্যক্তি। এমনকি ভুলবশতও কোন কাজ তাঁদের দ্বারা সম্পাদিত হবে না যাতে জনগণ ভাবতে না পারে যে, ভুলভ্রান্তির অজুহাত দেখিয়ে তাঁরা গুনাহে লিপ্ত হতে পারেন।

দ্বিতীয়ত নবিগণ মানবজাতির কাছে আল্লাহর বাণী বর্ণনা করা ছাড়াও মানুষকে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ ও পরিশুদ্ধকরণের দায়িত্বে নিয়োজিত। আর মানুষের আত্মশুদ্ধি ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একজন প্রশিক্ষকের আচরণ তাঁর কথার চেয়ে বেশি কার্যকর।

যে ব্যক্তির আচরণে দোষ-ত্রুটি রয়েছে তার কথা মানুষের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। প্রশিক্ষক হিসেবে মহান নবীদের প্রেরণের উদ্দেশ্য পূর্ণাঙ্গভাবে তখনই বাস্তবায়িত হবে যখন তাঁরা তাঁদের কথা ও কাজে সবধরনের ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত হবেন। তাই তাঁদের জন্য নিষ্পাপ হওয়া একান্ত জরুরি।

২. উদ্ধৃতিগত দলিল : পবিত্র কোরআনে একদল মানবকে 'মুখলাস' বা আল্লাহ কর্তৃক পরিশুদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর ইবলিস একমাত্র মুখলাস বান্দাগণ ব্যতীত সকলকেই পথভ্রষ্ট করার সংকল্প করেছে। পবিত্র কোরআনের সূরা সাদ-এর ৮২-৮৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

'সে (ইবলিশ) বলল : আপনার ক্ষমতার শপথ, আমি তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করবো, তবে তাদের মধ্যে যারা মুখলাস তাদেরকে নয়।'

নিশ্চয়ই বিপথগামিতা থেকে সংরক্ষিত থাকার কারণেই ইবলিশ তাদেরকে বিপথগামী করার দুরাশা করেনি। যদি সম্ভব হতো তবে কখনই সে তাদেরকে বিপথগামী করা থেকে বিরত থাকত না। আর নিঃসন্দেহে নবী-রাসূলগণ এ মুখলাস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

আবার পবিত্র কোরআন নবিগণকে নিঃশর্ত আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছে। যেমন সূরা নিসার ৬৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

'শুধু এ উদ্দেশ্যে আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাঁর আনুগত্য করা হবে।'

মহান নবিগণকে নিঃশর্ত আনুগত্য করা তখনই সঠিক হবে যখন তাঁরাও মহান আল্লাহর আনুগত্য করবেন এবং তাঁদের অনুসরণ কখনই আল্লাহর আনুগত্যের বিরোধী হবে না।

উপরিউক্ত আয়াত এবং আরো অনেক আয়াত থেকে নবিগণের নিষ্পাপত্বের বিষয়টি প্রমাণ করা যায়।

আরেকটি বিষয় হলো মহান আল্লাহ যেহেতু কল্যাণ ও অকল্যাণের বিষয়গুলো ওহীর মাধ্যমে অবহিত করেন সেহেতু ওহী সম্পূর্ণরূপে অবিকৃত অবস্থায় মানুষের নিকট পৌঁছতে হবে। আর এজন্য মানুষের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত যাবতীয় ভুল-ভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র থাকা প্রয়োজন। এ দিক থেকেও নবী-রাসূলগণকে অবশ্যই ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে হবে।

নবীকে চেনার উপায়

তিনটি উপায়ে নবী-রাসূলগণকে চেনা যায় :

১. যাঁর নবুওয়াতপ্রাপ্তি প্রমাণিত এমন নবী কর্তৃক পরবর্তী নবীর পরিচয় দান;

২. নবীর জীবন-যাপন পদ্ধতি ও তাঁর সঙ্গীদের পরিচয় ও

৩. মুজেজা প্রদর্শন।

মোজেযা : নবুওয়াতের দাবির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অলৌকিক কর্মকা-কে মোজেজা বলে। নবুওয়াতের দাবিদার কোন ব্যক্তির মাধ্যমে তা প্রদর্শিত হয়।

মোজেযার বৈশিষ্ট্য

১. শিক্ষা-প্রশিক্ষণের অপ্রয়োজনীয়তা : মোজেযা প্রদর্শনকারী ব্যক্তি কোন প্রকার শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ছাড়াই মোজেজা প্রদর্শন করেন;

২. অপ্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া : যেহেতু তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তাই অন্য কোন শক্তিই একে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না;

৩. বৈচিত্র্যময় হওয়া : মোজেযার ধরন সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা এমন ব্যাপক বৈচিত্র্যের অধিকারী যে, এদের মধ্যে ন্যূনতম মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন লাঠির সাপে পরিণত হওয়া, লাঠির আঘাতে নদীর মধ্যে পথ তৈরি হওয়া ইত্যাদি।

নবীদের সংখ্যা

মহান আল্লাহ মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে রাসূলের সংখ্যা তিনশ তের জন। হযরত আদম (আ.) সর্বপ্রথম ও হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সর্বশেষ নবী। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর আর কোন নবী আসবেন না।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ

মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী ।'- সূরা আহযাব : ৪০

মহান আল্লাহ প্রতিটি জাতির হেদায়েতের জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন । পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

وَ إِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

'এবং এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি ।'- সূরা ফাতির : ২৪

পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّـٰغُوتَ ۖ

'এবং আল্লাহর ইবাদত করা ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রতিটি জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি ।'- সূরা নাহল : ৩৬

পবিত্র কোরআনে ২৬ জন নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ করার অর্থ এ নয় যে, তাঁদের সংখ্যা এত কম ছিল । বরং কোরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে :

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَـٰهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ

'অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা পূর্বে আমি আপনাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা আপনাকে বলিনি ।'- সূরা নিসা : ১৬৪

রাসূলুল্লাহ (সা.) ব্যতীত অন্যান্য নবী তাঁদের নিজ নিজ জাতির মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন । পবিত্র কোরআনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে :

وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً

'আমরা আপনাকে মানবজাতির জন্য রাসূল করে প্রেরণ করেছি।'– সূরা নিসা : ৭৯

নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য

যদি 'নাবা' ধাতু থেকে নবী শব্দের উৎপত্তি হয়ে থাকে তাহলে এর অর্থ হবে গুরুত্বপূর্ণ বার্তার অধিকারী। আর যদি 'নুবু' ধাতু থেকে উৎপত্তি হয়ে থাকে তবে এর অর্থ হবে অতি সম্মানিত পদের অধিকারী।

নবী শব্দটি বাস্তব দৃষ্টান্তের দিক থেকে রাসূল শব্দ অপেক্ষা ব্যাপক অর্থ বহন করে। অর্থাৎ সকল প্রেরিত পুরুষই নবুওয়াতের মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু কিছু সংখ্যক নবী রিসালাতের দায়িত্বপ্রাপ্ত। আবার কেউ কেউ ইমামতের সম্মানেও ভূষিত। নবীদের নবী ছাড়াও আরো কিছু বিশেষণ রয়েছে। যেমন নাযির-মুনযির (ভয় প্রদর্শনকারী), বাশীর ও মুবাশশির (সুসংবাদদাতা), সালেহ (সৎকর্মশীল), মুখলাস (যাঁদেরকে আল্লাহ পবিত্র করেছেন) ইত্যাদি।

কিছু সংখ্যক নবী আসমানী কিতাবের অধিকারী ছিলেন। যেমন হযরত নূহ (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মুহাম্মাদ (সা.)।

উলুল আযম নবী

নবীদের মধ্যে হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁদেরকে উলুল আযম বা প্রধান নবী বলা হয়।

ওহী

নবীরা অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতোই খাওয়া-দাওয়া চলাফেরা ও অন্যান্য কাজ করতেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তির দিক থেকে তাঁরা ছিলেন অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। মহান আল্লাহ তাঁদের মাধ্যমেই মানুষকে হেদায়েত দান করেছেন। মহান আল্লাহ নবীদের সাথে সম্পর্ক-স্থাপন করতেন। এ সম্পর্ককে ধর্মীয় পরিভাষায় ওহী বলা হয়।

ওহী নাযিলের প্রকারভেদ : ওহী তিনভাবে নাযিল হতো :

১. আল্লাহর বাণী নবীর অন্তরে ফেরেশতাদের মাধ্যমে এমনভাবে নাযিল হতো যাতে নবী কোন ফেরেশতার ধ্বনি শুনতে পেতেন;

২. নবিগণ ফেরেশতার ধ্বনি শুনতে পেতেন এবং তাঁকে দেখতে পেতেন;

৩. ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়াই নবী সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণী লাভ করতেন।

ঐশী বিধানের প্রয়োজনীয়তা

এ সম্পর্কে বিখ্যাত ইসলামী পন্ডিত আল্লামা সাইয়্যেদ মুজতবা মুসাভী লারীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'মানুষ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান প্রতিষ্ঠা করতে গেলে কেবল মানুষের অস্তিত্বের প্রতিটি দিক সম্পর্কে জানলেই চলবে না উপরন্তু মানুষ যা কিছুর সঙ্গে নিজেকে বিজড়িত করে সেগুলো সম্পর্কেও পুরোপুরি অবগত হতে হবে। সমাজ এবং জটিল সামাজিক সম্পর্কগুলোর বিষয়েও থাকতে হবে সম্যক জ্ঞান। তদুপরি যিনি বিধান রচনা করবেন তথা আইন প্রণেতা হবেন তাঁকে হতে হবে বিভ্রান্তি বা বিকৃতি সৃষ্টি করতে পারে এমন সমস্ত উপাদান, যেমন ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, স্বার্থপরতা, নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি যেগুলো বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনের পথে বাধাস্বরূপ সেগুলো থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। বস্তুত এসব বিরূপ উপাদানের অস্তিত্বের কারণেই কোন্‌টি ভাল এবং কোন্‌টি মন্দ তা বিচার করতে গিয়ে মানুষের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়, পার্থক্য সৃষ্ট হয় ন্যায়বিচার কী তার সংজ্ঞা এবং বাস্তবায়ন নিয়ে।

রুগীর রোগ নির্ণয় না করে কি তার চিকিৎসা সম্ভব? মানুষের সারসত্তাকে পরিপূর্ণভাবে না বুঝে, মানুষের প্রকৃত স্বরূপকে পুরোপুরি উপলব্ধি না করে মানব সমাজের জন্য কোন আইন তথা বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা আর রোগ না জেনে রুগীকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা একই কথা।

যেহেতু আজ পর্যন্ত মানব সৃষ্ট কোন চিন্তাধারা বা দর্শন মানুষের প্রকৃত স্বরূপকে পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়নি তাই মানুষ যদি নিজেই নিজের জন্য আইন কানুন বা বিধান রচনার চেষ্টা করে তা সম্পূর্ণ নিস্ফল বা ব্যর্থ হতে বাধ্য। মানুষের মধ্যে যে রহস্য লুক্কায়িত আছে তা উন্মোচিত করার জন্য শত প্রচেষ্টা এবং সূক্ষ্ম ও জটিল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরিচালিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা সত্ত্বেও মানুষের

মধ্যে যে আত্মিক দিকগুলো রয়েছে, তার যে একটি বিরাট অন্তর্জগৎ রয়েছে একথা কে অস্বীকার করবে? একজন ব্যক্তি বিজ্ঞান ও কারিগরী বহু বিষয়ে অনেক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তার নিজের প্রকৃত সত্তার গতিপ্রকৃতি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অজ্ঞ হতে পারে। যে নিজের সম্পর্কে অজ্ঞ, অন্য অনেক কিছু সম্পর্কে তার অনেক জ্ঞান থাকলেও সেসবের মূল্য সামান্যই। জানা ও বোঝার ক্ষমতা যে সীমাবদ্ধ– এ কথা মানুষ যদি বুঝতে না পারে তাহলে নিজেকে আরও নানারকম অজ্ঞতার জালে জড়িয়ে ফেলে। এই বুঝতে না পারার কারণে মানুষ অনেক সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নিজের দৃষ্টিকে সরিয়ে রাখে।

মানুষের আত্মার যে বিস্ময়কর গতি-প্রকৃতি তাতে মানুষকে নিঃসন্দেহে এক গভীর অতলান্ত সমুদ্রের সাথে তুলনা করা যায়। মানুষ সম্পর্কে আমাদের যে জাগতিক জ্ঞান তা অবশ্যম্ভাবীভাবে নিতান্তই ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ। মানুষ নামক এ রহস্যময় সত্তার মধ্যে যে কত অপরিমেয় ক্ষমতা ও সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তার সবটুকু কার পক্ষে পুরোপুরি আবিষ্কার করা সম্ভব? সুতরাং আমাদেরকে এ সিদ্ধান্ত টানতেই হবে যে, আমাদের জ্ঞানের পরিমাণ অত্যন্ত সামান্য। জানার তুলনায় না জানার পরিমাণ সমুদ্রতুল্য এবং যতটুকু আমরা জানি তাও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং সংশয়ে আকীর্ণ।

সুতরাং বিজ্ঞান আজ একদিকে যেমন মানবীয় ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার মুখোমুখী তেমনি পাশাপাশি তা এ বিশ্বজগৎ ও মানবীয় সত্তার যে অপরিমেয় অসীমতা সেটাও অনুধাবন করতে পারছে। এর ফলে বিজ্ঞান নিজেই আজ এক ধরনের হীনমন্যতা এবং বিভ্রান্তি বোধ করছে। বিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে আমাদেরকে যেটুকু নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করতে সহায়তা করেছে বস্তুত তা হলো এই যে, মানুষের জ্ঞান কেবল এ অনন্ত বিস্তৃত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড-এর এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকেই তুলে ধরতে পারে। এখন বিবেচনা করে দেখা যাক কেবল বিজ্ঞান এবং বুদ্ধিবৃত্তি আমাদেরকে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারে কিনা। যেখানে একটি সত্তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বা সুনির্দিষ্ট জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়, মানুষ প্রকৃতপক্ষে কী সেটাই যখন বিজ্ঞানের দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যায় না, মানুষের শরীর কিংবা আত্মা কোনটিকেই বিজ্ঞান যখন নিখুঁত ও পরিপূর্ণভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারে না, মানুষের শারীরিক ও আত্মিক অস্তিত্বের মাধ্যমে মানুষ যে সব রহস্যময় সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলে সেগুলো সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যখন অসম্ভব, তখন মানব সমাজের জন্য একটি বুদ্ধিদীপ্ত ও মানবীয় চাহিদার সাথে

সঙ্গতিপূর্ণ বিধি বিধান গড়ে তোলার ক্ষমতা মানুষ কোথা থেকে অর্জন করবে? মানুষকে সত্যিকার অর্থে সুখী করে তুলতে পারে, মানুষের সকল রকম চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং মানুষ নিজের উন্নতির পথে চলতে পারে এমন বিধি-বিধান তৈরির ক্ষমতা মানুষ একা একা এ অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের সাহায্যে কোথা থেকে অর্জন করবে?

কি আমরা তৈরি করতে চাই, কেন তৈরি করতে চাই, কার জন্য তৈরি করতে চাই এগুলো সম্পর্কে যতক্ষণ না আমাদের পরিপূর্ণ ধারণা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন পরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপনের কথা বলারও এখতিয়ার আমরা রাখি না। যে সমস্ত চিন্তাধারা বা দার্শনিক মত দাবি করে যে, তারা মানবীয় ক্ষমতাবলির বিকাশ ঘটাতে সক্ষম, তারা মানুষ কী সেটা যথাযথভাবে না জেনেই এ রকম দাবি করে থাকে। কেমন করে তারা মানুষকে এতসব প্রয়াসের যোগ্য করে তুলতে সফল হতে পারে? উত্তরোত্তর ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠাই আজ মানবতার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত নয় বরং তার সামনে বিদ্যমান কোন্ পথটি সে নিজের এগিয়ে চলার জন্য বেছে নেবে সেটাই আজ বড় কথা।

অতীতের চিন্তাবিদরা অবিসংবাদিতভাবে অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয় এবং সূত্র মেনে নিতেন, কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে এবং বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অচল এবং ভ্রান্ত।

আমরা যদি বিভিন্ন জাতির সংবিধান সৃষ্টির ইতিহাসের দিকে নজর দেই তাহলে দেখবো অসাধারণ সব পণ্ডিত ব্যক্তির দীর্ঘদিনের গবেষণা, সতর্ক অধ্যবসায় এবং প্রভূত বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে গড়ে ওঠা অনেক আইন কানুনই পরবর্তী সময়ে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং অপর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। নতুন নতুন ও আরও সঠিক গবেষণার ফলে পুরানো আইন, অতীতে যা অভ্রান্ত বলে মনে হয়েছিল সেগুলোও ভ্রান্ত ও অপর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। গতকাল যে আইনের সামাজিক উপযোগিতা দেখা গেছে আজ সেই একই স্থান দখল করে নিচ্ছে নতুন আইন– চিন্তা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যা আবার সংশোধন-পরিবর্ধন করতে হবে।

অবশ্য এ কথা আমরা বলতে চাই না যে, মানবসৃষ্ট প্রতিটি আইনই মূল্যহীন, ভ্রান্ত। বরং মূল কথাটা এই যে, মানবসৃষ্ট আইন যেহেতু ভুলের ঊর্ধ্বে নয় তাই তা মানুষের বহুমাত্রিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ, ব্যর্থ গতিশীল সমাজের সাথে তাল মিলাতে। এ কথা

অনস্বীকার্য যে, অনেক মনীষীই আইন ও সংবিধান সম্পর্কে মূল্যবান মতামত দিয়েছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক, এসব মনীষীর চিন্তাধারা নবীদের শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।'– ডন পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নবুয়তের ধারা, পৃ.১৮-১৯

নবীদের একাধিক্য ও একের পর এক নবী আবির্ভাবের কারণ

১. পৃথিবীর সকল জায়গায় সকল লোকের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো এক নবীর পক্ষে সম্ভব না হওয়া;

২. নতুন নতুন সমাজের উদ্ভব, পুরাতন নিয়মের পরিবর্তে নতুন নিয়মের প্রয়োজনীয়তা ও

৩. কালের আবর্তে ধর্মে যে বিচ্যুতি ঢুকেছিল তা পরিশুদ্ধ করা।

অতএব, যদি একজন নবী ও তাঁর সহচর ও উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমে রেসালাতের প্রচার সম্পন্ন করা যায়; এক শরীয়তের নিয়ম-কানুন বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়; ভবিষ্যতে নতুন সমস্যা সমাধানের নিয়ম তাতে থাকে এবং শরীয়ত অবিকৃত থাকার নিশ্চয়তা থাকে তবে আর নবী-রাসূলের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি অর্থ হেদায়েতের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া নয়।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তন প্রতিনিয়ত ঘটছে, তাই এ ধরনের পরিবর্তন নতুন শরীয়ত দাবি করতেই পারে। এর জবাব হলো কিরূপ পরিবর্তন মূল নিয়মের পরিবর্তনের আবেদন করে তা চিহ্নিত করা সাধারণের ক্ষমতার বাইরে। বরং মহান আল্লাহই তা ভালো জানেন।

ইসলাম ও বহুমাত্রিকতা

আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার

অনুবাদ : ড. মো. আলতাফ হোসেন

বর্তমান বিশ্বে দ্রুত প্রসারমান আধুনিকতা, উদারপন্থা এবং বিশ্বায়নের প্রভাবে একই দেশে নানা ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি বিরাজমান থাকায় বহুমাত্রিকতার প্রসার ঘটছে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে সামন্তবাদী আর্থ-সামাজিক এবং সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে অথবা দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছে। অতীতে রাষ্ট্র শক্তি ছিল একক কর্তৃত্বশীল এবং সেখানে সুশীল সমাজের কোন ধারণা ছিল না। মানুষের ব্যক্তি অধিকার ছিল না, তারা ছিল বাষ্ট্রের সেবাদাস। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাগরিকদের সুনির্দিষ্ট অধিকার নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সুশীল সমাজ এক বিশেষ ধরনের স্বায়ত্বশাসন ভোগ করে এবং এখানে মানবাধিকার এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

বহুমাত্রিক সমাজে মানবাধিকার একটি মৌলিক ইস্যু। সকল ধর্ম, ভাষা ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী এখানে সুনির্দিষ্ট অধিকার ভোগ করে এবং কোনভাবেই তাদের অধিকার রাষ্ট্র অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের অনুকম্পার নির্ভরশীল নয়। এজন্যই আধুনিক বহুমাত্রিক সমাজে সুশীল সমাজের ধারণা একটি মৌলিক বিষয়।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম বহুমাত্রিকতাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে থাকে তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ইসলাম কি বহুমাত্রিকতা অনুমোদন করে অথবা এককেন্দ্রিক

সমাজের পৃষ্ঠপোষক? আমরা যখন বহুমাত্রিকতা নিয়ে আলোচনা করি তখন আমরা কি রাজনৈতিক বহুমাত্রিকতা অথবা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বহুমাত্রিকতা বুঝিয়ে থাকি? এ নিবন্ধে আমরা ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বহুমাত্রিকতা নিয়ে আলোচনা করব যদিও রাজনৈতিক বহুমাত্রিকতার স্বতন্ত্র গুরুত্ব রয়েছে এবং এটি ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বহুমাত্রিকতার একটি মৌলিক উপাদান। কেউ যদি কুরআন থেকে ইসলামের মৌলিক জ্ঞানের সন্ধান করে তাহলে দেখতে পাবে ইসলাম ধর্মীয় বহুমাত্রিকতাকে কেবল অনুমোদনই করে না; বরং এটি ইসলাম ধর্মীয় বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ ব্যাপারে কুরআনের স্পষ্ট আয়াত রয়েছে। প্রথমত আমরা কুরআনের ৫ নং সূরা আল্ মায়েদার ৪৮ নং আয়াত উল্লেখ করব যাতে বলা হয়েছে : 'আমি তোমাদের প্রতিটি সম্প্রদায়ের (জাতির) জন্য শরীয়ত ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছি; আল্লাহ তা'আলা চাইলে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত (জাতিতে) বানিয়ে দিতে পারতেন বরং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তার ভিত্তিতে তোমাদের যাচাই বাছাই (পরীক্ষা) করে নিতে চেয়েছেন। অতএব, তোমরা সবাই ভাল কাজে প্রতিযোগিতা কর। (কেননা,) আল্লাহ তা'আলার দিকেই হবে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। তোমরা যে সব বিষয় নিয়ে মতভেদ করতে তিনি অবশ্যই তা তোমাদের (স্পষ্ট করে) বলে দিবেন।'

ইসলামে ধর্মীয় এবং আইনগত বহুমাত্রিকতার সপক্ষে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি। বহু সংখ্যক প্রাচীন এবং আধুনিক ব্যাখ্যাকারী এ আয়াত সম্পর্কে মতামত পেশ করেছেন। এ আয়াতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো, 'আমি তোমাদের প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য শরীয়ত ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছি।' প্রত্যেক সম্প্রদায় বলতে এখানে প্রত্যেক জাতিকে বুঝানো হয়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়- তথা ধর্মীয় বা ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর নিজস্ব শরীয়ত এবং কর্মপন্থা (মিনহাজ) রয়েছে এবং নিজস্ব শরীয়ত ও কর্মপন্থা চর্চার মধ্য দিয়েই তারা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন করে থাকে। 'শরীয়াহ' বা 'সিরাহ' দ্বারা আক্ষরিক অর্থে 'পানির উৎসমুখী পথ' (যা থেকে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী তাদের জীবনের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন মিটায়) বুঝায়। কুরআনে এটিকে একটি জাতির সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের পন্থা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যদিকে 'মিনহাজ' বলতে একটি উন্মুক্ত পথ (জীবন প্রণালী) বুঝানো হয়েছে।[১]

ফলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে আল্লাহ্ সে জাতির প্রজ্ঞা এবং তাদের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য যে ধরনের বিধান প্রয়োজন সেরকম প্রত্যাদেশসহ নবীদের প্রেরণ করেছেন। আরও গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ চাইলে তোমাদের এক উম্মায় (জাতিতে) পরিণত করতেন।' মানবগোষ্ঠীকে এক জাতিতে পরিণত করা আল্লাহ্র জন্য মোটেই কোন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু আল্লাহ্ মানুষকে বহুমাত্রিকতা দিয়ে ধন্য করেছেন এবং মানব জীবনকে বৈচিত্র্য দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু এ সকল বিধান বা জীবন-প্রণালী যতই ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র হোক না কেন এদের প্রতিটির উদ্দেশ্যই হল মানুষের জীবন-মানের উন্নয়ন এবং উৎকর্ষ সাধন।

এ আয়াতের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে। বিখ্যাত মনীষী শাহ ওয়ালি উল্লাহ্ এবং মাওলানা আবুল কালাম আজাদ (ভারত) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ওয়াহ্দাত-ই-দীন বা ধর্মীয় ঐক্যের একটি ধারণা তুলে ধরেছেন।

এ আয়াতের[২] পূর্ববর্তী অংশে বলা হয়েছে, '(হে মুহাম্মাদ!) আমি তোমার প্রতি সত্য (দীন)সহ কিতাব নাযিল করেছি যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের (যা কিছু অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে) প্রত্যায়নকারী এবং এ কিতাব তার হেফাযতকারী (মিনহাজ)।' এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী। ফলে কুরআন পূর্ববর্তী নবীদের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির কাছে যে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছিল তার সত্যায়নকারী হিসেবে পরিগণিত। শরীয়াহ তথা জীবনবিধানের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সকল ধর্মের মূল প্রতিপাদ্য এক। সকল ধর্মের ভিত্তি হল আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ। এজন্যই কুরআন সত্যবাণী সম্বলিত পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের হেফাযতকারী। ধর্মের গ্রহণযোগ্যতার জন্য এটি একটি অপরিহার্য দৃষ্টিভঙ্গী।

কুরআনে কিছু সংখ্যক নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে যা উদাহরণস্বরূপ– চূড়ান্ত তালিকা নয়। ফলে এ তালিকায় আরও কিছু ধর্ম বিশ্বাসকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। অন্য একটি আয়াতে আরও তাৎপর্যপূর্ণভাবে বলা হয়েছে, 'তোমরা তোমাদের মুখ পূর্ব দিকে ফেরাও বা পশ্চিম দিকে ফেরাও এতেই সব সত্য (দীন) নিহিত নেই। তবে আসল কল্যাণ হচ্ছে একজন মানুষ ঈমান আনবে আল্লাহ্র ওপর, পরকালের ওপর, ফেরেশতা ওপর, (আল্লাহ্র) কিতাবের ওপর, (কিতাবের বাহক) নবী-রাসূলদের ওপর এবং আল্লাহ্র দেওয়া সম্পদ তারই ভালবাসা পাবার মানসে

আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন (অভাবগ্রস্ত) ও পথিক মুসাফিরের জন্য ব্যয় করে, সাহায্যপ্রার্থী (দুস্থ মানুষ) এবং সর্বোপরি মানুষকে (কয়েদ ও দাসত্ব) বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার জন্য অর্থ ব্যয় করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করে এবং ক্ষুধা-দারিদ্রের সময় ও দুর্দিনে ধৈর্যধারণ করে। (মূলত) এরাই হচ্ছে সত্যবাদী এবং এরা হচ্ছে প্রকৃত আল্লাহ্ভীরু।'[৩] এ আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, কুরআন এমন আদর্শ মানব তৈরি করতে চায় যে সত্যপন্থী, অভাবী ও বঞ্চিতদের প্রতি সহায় এবং বন্দি ও দাসদের মুক্ত করার জন্য যে সম্পদ ব্যয় করে, ইয়াতিমদের প্রতি যে যত্নশীল, ওয়াদা পালনকারী, বিপদ-বিপর্যয়ে যে ধৈর্যশীল। এবং এরকম লোকই মুত্তাকী (আল্লাহ্ওয়ালা এবং আল্লাহ্র আদেশ পালনে তৎপর)।

কুরআনে কোন সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী নেই। কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত মানবিক এবং এটি ধর্মমতের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে সৎকর্মের প্রতি গুরুত্ব দেয়। সমাজ ও মানব জাতির জন্য ক্ষতিকর কর্মকে প্রচ- নিন্দা জানায় এবং এসকল ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুলিমের মধ্যে কোন বৈষম্য করে না। এ জন্যই কুরআনে বলা হয়েছে, '...যে কেউ পাপাচারী হবে তাকেই সেজন্য সাজা দেওয়া হবে এবং এ ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন পৃষ্ঠপোষক বা সাহায্যকারী পাবে না।'[৪]

সুতরাং মুসলিম বা আহলে কিতাবদের বেলায় কেউ আল্লাহ্র আইনে কোন ব্যতিক্রম দেখতে পাবে না। যে সৎকর্ম করবে সে-ই পুরস্কার পাবে এবং যে পাপাচারী হবে সে-ই শাস্তি পাবে। কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে, 'যে কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করবে (সেদিন) তাও সে দেখতে পাবে। (ঠিক তেমনি) যে কেউ অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, তাও সে দেখতে পাবে।'[৫]

কুরআন বিবেকের স্বাধীনতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় এবং বহুমাত্রিকতার জন্য বিবেকের স্বাধীনতা চাবিস্বরূপ। কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্র দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই'[৬] এবং 'আমি অবশ্যই আদম সন্তানদের মর্যাদা দান করেছি'[৭]। কুরআন আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ব্যাপারে একটি সীমা বেধে দিয়েছে, '(হে মুসলমানগণ!) তোমরা কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থা ছাড়া কোন রকম তর্ক-বিতর্ক কর না। আর বল : আমরা ঈমান এনেছি (কিতাবের) যা কিছু আমাদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, আরও ঈমান এনেছি যা কিছু তোমাদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে; আসলে আমাদের এবং তোমাদের প্রভু হচ্ছেন একজন; এবং আমরা সবাই তাঁরই

কাছে আত্মসমর্পণ করি।'[৮] কুরআনে মানবজাতির ঐক্যকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে, '(এক সময়) সব মানুষ একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিল ... ।'[৯] পুরো আয়াতটিতে বহুমাত্রিকতা এবং বিশ্বাস ও বিকেকের স্বাধীনতাকে পরিব্যাপ্ত করা হয়েছে। এ আয়াতের মর্মানুযায়ী গোটা মানবম-লী ছিল এক জাতি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর নিকট সমসাময়িক অবস্থার সাথে সংগতিশীল প্রত্যাদেশসহ নবীদের আবির্ভাব হয়েছে যাতে তাঁরা পথ প্রদর্শক এবং সতর্ককারী হতে পারেন। অবস্থার ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর জীবনবিধানে ভিন্নতা তৈরি হয়েছিল। এ বহুমাত্রিকতার কারণে মানুষের মধ্যে মতভেদ তৈরি হয় এবং তারা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করার পরিবর্তে শত্রুতা পোষণ করতে থাকে। ফলে মানবজাতির মধ্যে বিভক্তি দেখা দেয়। অথচ এটি ছিল ঐশী বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহ্ তাদেরকেই সৎপথ প্রদর্শন করেন যারা নিজেদের মধ্যে মতভেদের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে অবহিত।

কুরআনে বিভিন্নভাবে মানবজাতির অখ-তা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানবজাতি একটি সত্তা থেকে তৈরি[১০]; এবং তারা একই পিতা-মাতার বংশজাত[১১]। তারা যেন একই বাড়িতে বসবাস করে, পৃথিবী হল তাদের জন্য বিশ্রামাগার এবং বেহেশ্ত হল তাদের জন্য ছায়াস্বরূপ। মানবজাতির অখ-তার পাশাপাশি কুরআন বর্ণ, ভাষা এবং জাতিসত্তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। এ সকল বৈচিত্র্যকে আল্লাহ্র নিদর্শন বলা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে, '... তোমাদের পারস্পরিক ভাষা ও বর্ণ-বৈচিত্র্য (নিঃসন্দেহে) তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহের মাঝে (একটি বড় নিদর্শন); অবশ্যই জ্ঞানবান মানুষদের জন্য এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে।'[১২] মানুষের মধ্যে ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্যকে আল্লাহ্র নিদর্শন বলা হয়েছে।

সুতরাং এ বৈচিত্র্যকে সম্মান করতে হবে। বৈচিত্র্যের কারণ হল পরিচিতি লাভ। কুরআনে বলা হয়েছে, 'হে মানুষ! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি; এরপর আমি তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে (এর মাধ্যমে) তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার।'[১৩] সুতরাং জাতি ও গোত্রের আলাদা বৈশিষ্ট্য পারস্পরিক পরিচিতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উপাদান। বিরোধ সৃষ্টির কোন হাতিয়ার নয়। এজন্যই কুরআন জাতি ও গোত্রের বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে একে আইনগত বৈধতা দিয়েছে। পাশাপাশি এটি আর একটি বিষয়ের ওপর জোর দেয়। তা হল ধর্মীয় উপাসনালয়সমূহের পবিত্রতা অবশ্যই

সংরক্ষণ করতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছে, 'যদি আল্লাহ্ মানবজাতির এক দলকে আরেক দল দিয়ে শায়েস্তা না করতেন তাহলে দুনিয়ার বুক থেকে মঠ, গির্জা, উপাসনালয় (ইহুদীদের) এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেখানে সবসময় আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হয়।'[১৪] এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে কুরআনে বলা হচ্ছে গির্জা, উপাসনালয় ও মসজিদ সবর্ত্রই সদা আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হয়। সুতরাং কোন ধর্মীয় উপাসনালয়কে এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি এবং এভাবে কুরআন বহুমাত্রিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছে। ইসলামের নবী মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় গিয়ে একটি ধর্মীয় ও গোত্রীয় বৈচিত্র্যময় পরিবেশ দেখতে পান। তিনি এ বৈচিত্র্যকে শুধু গ্রহণই করেননি; বরং একটি চুক্তি প্রণয়ন করে বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের মধ্যে সহাবস্থান এবং নিজ নিজ ধর্মাচার পালনের বৈধতা দান করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটি মদিনা সনদ (মিসাক-ই-মদিনা) নামে সুপরিচিত।

এ চুক্তির শুরুতে বলা হয়েছে, 'পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে। এ চুক্তি নবী মুহাম্মাদ এর পক্ষ থেকে যিনি বিশ্বাসী এবং কুরাইশ এবং মদিনার মুসলিমদের নবী এবং যারা তাদের অনুসারী, তাদের সঙ্গী এবং তাদের সাথে মিলে যুদ্ধ করে; অন্য সব মানুষের মোকাবিলায় তারা এক জাতি।' এ চুক্তিকে মদিনার শাসনতন্ত্র বলা যেতে পারে এবং নতুন রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপনের জন্য এটি ছিল একটি মাইলফলক। গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এ চুক্তির ফলে মক্কা থেকে আগত কুরাইশ গোত্র এবং মদিনার আওস ও খাজরায গোত্রের মুসলিমগণ এবং বিভিন্ন গোত্রের ইহুদী মিলে একটি একক জাতিতে পরিণত হয়। এ চুক্তিতে একটি গণতান্ত্রিক ভাবধারা কাজ করেছে। নবী নিজেকে এ জাতির শাসক হিসেবে দাবি করেননি। এখানে মুহাজিরদের একটি গোষ্ঠী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে যার নেতা নবী (সা.) এবং সেখানে আরও আটটি গোষ্ঠী ও তাদের নেতারাও ছিল। এ সনদে দু'টি ব্যাপারে নবী (সা.)-কে অন্য নেতাদের থেকে আলাদা করা হয়েছে : প্রথমত বিশ্বাসী তথা মুসলিমদের জন্য তিনি নবী এবং তাঁর কাছে যে ঐশী বাণী অবতীর্ণ হয় তা মানা মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক; দ্বিতীয়ত এ সনদে বলা হয়েছে, যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ হলে সে বিষয়ে ফয়সালা দেবেন আল্লাহ্ ও নবী। আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজ শক্তিশালী, স্থিতিশীল এবং উৎকর্ষ অর্জন করতে পারবে না যদি ধর্মীয় বহুমাত্রিকতাকে আইনসংগত জীবনবিধান হিসেবে মেনে নেওয়া না হয়।

ইসলামী রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের উচিত একদিকে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা এবং অন্য দিকে আধুনিক বিশ্ব বাস্তবতার আলোকে নতুন রাজনৈতিক তত্ত্ব উপস্থাপন করা। ইসলাম এবং তথাকথিত আধুনিক জীবন ব্যবস্থার মধ্যে কোন বিরোধ থাকা উচিত নয়। সুশীল সমাজে একজন ব্যক্তি বা নাগরিকের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের যে ধারণা উদ্ভব হয়েছে তা কুরআনের শিক্ষার সাথে কোন বিরোধ সৃষ্টি করে না। মানবাধিকার একজন ব্যক্তির মর্যাদা এবং বিবেকের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে। কুরআনে বলা হয়েছে, 'আমি অবশ্যই আদম সন্তানদের মর্যাদা দান করেছি।'[১৫] এখানে সম্মানজনকভাবে বাঁচার অধিকার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের সৃজনশীল এবং গঠনমূলক মনোবৃত্তি নিয়ে বিংশ শতাব্দীতে এগিয়ে যেতে হবে যেখানে কুরআনের আলোকে বিশ্বাসীরা নিজেদের জন্য মুক্ত এবং মর্যাদাবান জীবনের পাশাপাশি অন্য ধর্মাবলম্বীদের মর্যাদা দানের ব্যাপারেও সচেতন থাকব। কুরআন ১৪০০ শ' বছর পূর্বে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ধর্মবিশ্বাসকে মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছে। পরবর্তীকালে যরথুষ্ট্র এবং বারবাররা এ ধারণাকে গ্রহণ করেছিল।

আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, 'কাফির' এবং 'মুশরিক' শব্দ দু'টির ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে এবং এ শব্দ দু'টি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক এবং সংযমের পরিচয় দিতে হবে। শুধু যারা যে কোনভাবেই সত্যকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, সম্পূর্ণভাবে সৎকাজ পরিহার করে এবং অসৎ পথের দিকে আহ্বান করে তারাই কাফির এবং যারা আল্লাহ্‌র একত্বকে অস্বীকার করে এবং তাঁর সাথে শরীক করে শুধু তারাই মুশরিক।

এটি মনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, কাফির ও মুশরিকরা যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের প্রচলিত আইন তথা শান্তি ভঙ্গ না করে ততক্ষণ তাদের নাগরিক অধিকারকে সমুন্নত রাখতে হবে। কোন অবস্থাতেই একজন মানুষকে তার বিশ্বাসের জন্য বিবেকের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে একটি বহুমাত্রিক সমাজ যেখানে প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা এবং বিবেকের স্বাধীনতা নিশ্চিত থাকবে ইসলাম কোনভাবেই তার সাথে বিরোধ করে না।

তথ্যসূত্র :

১. মো. আসাদ, দি মেসেজ অব কুরআন, জিব্রালটার, ১৯৮০, পৃ. ১৫৩
২. সূরা মায়েদা : ৪৮
৩. সূরা বাকারা : ১৭৭
৪. সূরা আন নিসা : ১২৩
৫. সূরা যিলযাল : ৭-৮
৬. সূরা বাকারা : ২৫৬
৭. সূরা বনি ইসরাইল : ৭০
৮. সূরা আনকাবুত : ৪৬
৯. সূরা বাকারা : ২১৩
১০. সূরা নিসা : ১
১১. সূরা হুজুরাত : ১৩
১২. সূরা রূম : ২২
১৩. সূরা হুজুরাত : ১৩
১৪. সূরা হজ্ব : ৪০
১৫. সূরা বনি ইসরাইল : ৭০

(তেহরান থেকে প্রকাশিত ইকো অব ইসলাম, স্প্রিং ২০০৬ সংখ্যার 'ইসলাম অ্যান্ড প্লুরালিটি' নিবন্ধের বঙ্গানুবাদ)

ইসলাম ও আধুনিকতাবাদ : একটি পর্যালোচনা

সংকলন : আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

[পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিস্তার ও তদ্বারা প্রাচ্য সংস্কৃতি বিশেষত ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাবিত হওয়া, এমনকি কোন কোন প্রাচ্যভূমির পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে লীন হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এ ধরনের একটি অনুসন্ধানী আলোচনার প্রয়োজনীয়তা সামনে আসে। পাশাপাশি ইসলামী সংস্কৃতি ও আধুনিক সংস্কৃতির মধ্যকার সম্পর্ক এবং এতদুভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য নাকি বৈরিতা বিরাজমান, তা জানা মুসলমানদের জন্য অধুনা বিশ্বদৃষ্টি গড়ার ক্ষেত্রে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই বক্ষ্যমাণ নিবন্ধটি ইসলামী চিন্তাধারা ও আধুনিকতাবাদের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।]

সূচনা

প্রাচ্যের অধিবাসীদের (যাদের অন্যতম মানবগোষ্ঠী হচ্ছে মুসলমান জনগণ) জন্য আধুনিক বিশ্বদৃষ্টির সাথে পরিচিত হওয়া ও নতুন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে চেনা কয়েকটি দিক থেকে আবশ্যক। যথা :

১. পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দ্রুত ও বহুমুখী বিবর্তন আধুনিক বিশ্বকে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিগত শতকগুলো হতে উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক করে দিয়েছে। এই যে বহুমাত্রিক বিবর্তন, যা নিজের সাথে বিভিন্ন প্রযুক্তি ও শিল্পের উন্মেষ ঘটিয়েছে, এর ফলে পশ্চিমা মানুষের পক্ষে বস্তুজগতকে খুবই অনায়াসে ও ব্যাপক হারে ব্যবহারের কারণ হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, পাশ্চাত্য সভ্যতায় বস্তুজগতকে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করা এবং তার ফলে প্রকৃতিকে করতলগত করার সর্বাত্মক চেষ্টা ও প্রয়াসের কারণে পশ্চিমা মানুষ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও শক্তিশালী প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ পথে তারা এতটাই সাফল্যের স্বাক্ষর

রেখেছে যা আধুনিক যুগকে অতীত যুগসমূহ হতে সুস্পষ্টরূপে পৃথক রূপ দান করেছে। যেন মনে হয়, আধুনিক মানুষ অতীত যুগের মানুষ থেকে ভিন্ন এক মানুষ।

প্রাচ্যবাসী কর্তৃক (উপনিবেশবাদের সুবাদে) এ সমস্ত উন্নয়ন (?)[১] প্রত্যক্ষ করার পাশাপাশি পাশ্চাত্য শিল্প ও প্রযুক্তি দ্রুতগতিতে প্রাচ্যের দেশগুলোতে ঢুকে পড়ার কারণে এখানকার অনেক চিন্তাবিদ সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তাঁরা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আত্মপরিচয় ভুলে গিয়ে নতুন এক বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। আর তাহল, মানব জাতির উন্নতির একমাত্র তরিকা হল সেটাই, যে পথ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আধুনিক বিশ্ব পাড়ি দিয়েছে। অতঃপর তারা তাদের এ বিশ্বাসকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়।

২. অপরদিকে পাশ্চাত্যের নতুন দুনিয়া স্বীয় অহঙ্কারী ও শক্তিমত্ত প্রবণতার মাধ্যমে বিভিন্ন দিক থেকে নিজের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে অপরাপর দেশসমূহের সংস্কৃতি ও সভ্যতার ওপর চাপিয়ে দেয়। তাদের বিশ্বাস, কোন সংস্কৃতিই টিকে থাকার মূল্য রাখে না। এজন্য তারা বিভিন্ন স্লোগান তুলে ও নানা হাতিয়ার প্রয়োগ করে অন্যদের সংস্কৃতিতে ছিদ্র সৃষ্টি করে ও তাকে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে গোটা দুনিয়াকে নিজের সংস্কৃতির অনুবর্তী করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। এ লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক হাতিয়ারকে কাজে লাগায়।

৩. যে জিনিসটি আধুনিক বিশ্বকে জানা এবং তাদের প্রধানতম চিন্তাচেতনা গুলো অবগত হওয়ার গুরুত্বকে আরো বাড়িয়ে তোলে তাহচ্ছে মুসলিম বিশ্বে বিরাজমান সাংস্কৃতিক অবস্থা ও পরিস্থিতি। এতদাঞ্চলে অধুনা বিশ্বদৃষ্টির তার যাবতীয় অনুসঙ্গ সহকারে অযাচিত উপস্থিতি এবং এ বিশ্বদৃষ্টির প্রতি মানুষের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ ও ঝোঁক, যা আধুনিক এ চিন্তা-দর্শনের ওপর সূক্ষ্ম ও সর্বব্যাপী গবেষণা ও অনুসন্ধানের আবশ্যকতাকে অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় আরো জোরালো করে। বিষয়টি এত বেশি সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে ইসলামের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচিতি ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কাজেই পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন যে আধুনিক বিশ্বদৃষ্টি কি ইসলামী বিশ্বদৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাকি এ দুয়ের মাঝে সম্পর্কটা সাংঘর্ষিক ও বৈরিতাপূর্ণ?

---

১. আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে প্রাকৃতিক জগত হতে যত বেশি সম্ভব সুযোগ সুবিধা গ্রহণকে যদি উন্নয়ন ও অগ্রসরতা বলা যৌক্তিক হয় সেক্ষেত্রে।

এখানে একটি প্রশ্ন আসে। তা হল ইসলামের কি এমন কোন নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা সম্ভব যা আধুনিক চিন্তা-দর্শনের সাথে একই আকিদা-বিশ্বাসের ছাদের নিচে সহাবস্থান করতে সক্ষম হবে? সেক্ষেত্রে ইসলামের একটি ব্যাখ্যা হবে প্রচলিত, আরেকটি ব্যাখ্যা হবে আধুনিক।

একইভাবে এ প্রশ্নটিও আসে যে, আধুনিক নীতি-নৈতিকতা কি তার প্রতিদ্বন্দ্বী নৈতিক আদর্শসমূহকে–যার অন্যতম হল ইসলামী নৈতিক মূল্যবোধ–কি ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে হটিয়ে দিবে? নাকি কোন বৈরিতা ব্যতিরেকেই মুসলমানদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে স্বীয় উপস্থিতি বজায় রেখে চলতে সক্ষম? কেবল নীতি-নৈতিকতার অঙ্গনই নয়, আধুনিক জ্ঞানতত্ত্ব, আধুনিক নৃতত্ত্ব, আধুনিক অর্থনীতি ইত্যাদি অঙ্গনগুলোও উপরিউক্ত প্রশ্নের আওতায় আসতে পারে। কেননা, এগুলো সবই বিশেষ এক ভিত্তিমূলের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

এ সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর এবং ইসলামী বিশ্বদৃষ্টি ও আধুনিক বিশ্বদৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্কের সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা মুসলিম চিন্তাবিদদের জন্য একটি মৌলিক আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। একইভাবে সত্যান্বেষীদের জন্যও এটা বাঁচা-মরার প্রশ্ন বটে। একারণে এ নিবন্ধে বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনার সূচনা করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার পরিসর স্বভাবতই অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। এর সবগুলো শাখা-প্রশাখা নিয়ে আলোচনা করা এ ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। একারণে এখানে কেবল আধুনিক বিশ্বদৃষ্টির কয়েকটি চিন্তা-বিশ্বাস ব্যাখ্যা করা এবং ইসলামী চিন্তা-বিশ্বাসের সাথে তার সংক্ষিপ্ত তুলনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হল :

এক নজরে আধুনিক চিন্তাধারার স্বরূপ

মনুষ্য চিন্তা-চেতনার অঙ্গনে ব্যবহৃত 'শব্দ' ও 'পরিভাষা'র দুর্বোধ্যতা তথা অস্পষ্টতা হল অন্যতম মরণফাঁদ ও বুদ্ধিনাশক হাতিয়ার। এ হাতিয়ার প্রয়োগ করে মানুষের প্রতি ও তার চিন্তাচেতনার প্রতি অনেক অবিচার করা হয়েছে। একারণে সর্বাগ্রে আলোচনার 'কী-ওয়ার্ড' তথা মূল শব্দগুলোর ব্যাখ্যা এবং তা হতে অস্পষ্টতা দূর করা যেমন জরুরি, তদ্রূপ সেগুলোর সম্ভাব্য ও ভিন্ন ভিন্ন অর্থের মধ্য থেকে উদ্দিষ্ট সঠিক অর্থটি নির্ধারণ করাও অত্যাবশ্যক। অন্যথায় এ জাতীয় বিষয়ে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার প্রয়াস সঠিক ও সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন করা সম্ভবপর নয়।

এ আলোচনায় চারটি পরিভাষাই মূল। যথা :

১. Modern

২. Modernity

৩. Modernism

৪. Modernization.

প্রথমে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবৃন্দের দৃষ্টি থেকে এ পরিভাষাগুলোর বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া যাক। তাহলে যে প্রশ্নের উত্তর আমরা অনুসন্ধান করছি অর্থাৎ 'ইসলামী বিশ্বদৃষ্টির সাথে আধুনিক বিশ্বদৃষ্টির সম্পর্ক কী'- তা খুঁজে পাওয়া আমাদের জন্য সহজতর হবে।

১. Modern : ল্যাটিন modo কথাটি হতে গৃহীত, যার অর্থ of today বা 'আজকের' তথা 'আধুনিক'– যা অতীত বা পুরাতনের স্থলে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সকলে গ্রহণ করেছে।[১]

এ পরিভাষাটি তার সাধারণ প্রয়োগে দ্রব্য তথা জিনিসের বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে 'আধুনিক জিনিস' হচ্ছে এমন একটি জিনিস যা পুরাতনের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। সে হিসাবে প্রথম পালচালিত জাহাজ যা তৎপূর্বেকার হস্ত বা পদচালিত লম্বাকৃতি ও কম উচ্চতাবিশিষ্ট জাহাজের স্থলাভিষিক্ত হয়, সেটাই একদিন আধুনিক জাহাজ ছিল। একইভাবে একদিন পালচালিত জাহাজের স্থলে বাষ্পীয় ইঞ্জিনচালিত জাহাজ এবং বাষ্পীয় ইঞ্জিনচালিত জাহাজের স্থলে আজ পরমাণু শক্তিচালিত জাহাজ আধুনিক হিসাবে গণ্য।[২]

এটা হল Modern কথাটির আভিধানিক ব্যাখ্যা। কিন্তু পারিভাষিক ব্যাখ্যায় Modern কথাটি বিশেষ এক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অর্থের স্বরূপ বহন করে, যা প্রথমত ঐতিহাসিক দিক থেকে একটি অধুনা ও নতুন বিষয় এবং দ্বিতীয়ত যা কিছুই ধর্ম ও সুন্নাত তথা রীতি-প্রথার ওপর প্রতিষ্ঠিত, তার সবকিছুকেই সরিয়ে দিয়ে শুধু ওহীবিচ্ছিন্ন (মনুষ্য) বুদ্ধিকেই একমাত্র উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করে। আর এর ফলে

১. Lawrenc CAhoone, From Modernism to postmodernism, (Blachwell), 1996, P.11 .

২. Alex Inkeles, a model of modern man, in Modernity critical concepts, v.2, (Routledge). 1999. P. 94 .

প্রাচীন রীতি-প্রথা ও নিয়ম-কানুন, ধর্মীয় ও ওহীসূত্রে প্রাপ্ত বিষয়াবলি, যাদুটোনা, কুসংস্কার ইত্যাদি সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

যদিও আধুনিক যুগের সূচনাকাল নিয়ে পশ্চিমা পণ্ডিত ও চিন্তাবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু সকলে এ বিষয়ে একমত যে, মধ্যযুগীয় অধ্যায়টি আধুনিক কাল ছিল না। বরং আধুনিক কালের সূচনা ঘটে মধ্যযুগ অস্তমিত হওয়ার পরে।

পশ্চিমা লেখকবৃন্দের বিশ্বাস মতে, মধ্যযুগীয় বিশ্বদৃষ্টি ছিল ধর্মীয় বিশ্বদৃষ্টি এবং সম্পূর্ণরূপে ধর্ম দ্বারা পরিচালিত। আর মধ্যযুগীয় মানুষ বস্তুজগতকে একটি দোলনার ন্যায় মনে করত যার দুই প্রান্ত রশি দ্বারা অন্য কোন জিনিসের সাথে বাঁধা। অর্থাৎ এক দিক হতে তারা বস্তুজগতকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল মনে করত। আর অপরদিক হতে তা পরকালের সাথে সম্পৃক্ত ও আবদ্ধ মনে করত। একারণে মধ্যযুগীয় মানুষ বস্তুজগতের সব ঘটনাকেই তার উৎপত্তি ও শেষ পরিণতির কথা বিবেচনায় রেখে ব্যাখ্যা করত।

মানুষ সম্পর্কে মধ্যযুগে বিরাজমান ধর্ম তথা খ্রিস্টবাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আদম ও হাওয়া নিষিদ্ধ বৃক্ষ হতে ভক্ষণ করার পরে পাপে পতিত হন এবং পৃথিবীতে নেমে আসতে বাধ্য হন।[১] পৃথিবীতে তাঁরা ক্ষুধা ও পিপাসা নিবারণে নিরুপায় হয়ে চেষ্টা চালান এবং স্বীয় দাম্পত্য জীবনে সন্তানবর্গ ও অন্য মানুষদের জন্ম দান করেন।

আদম ও হাওয়ার পাপের সূত্রে তাঁদের সন্তানরা 'ধ্বংস ও পাপ' প্রবণতাবিশিষ্ট দুই সহজাত প্রবৃত্তির অধিকারী হয়। মানুষের এই কু-সত্তা তাকে সর্বদা অমঙ্গল, পাপ ও অন্যায়ের প্রতি চালিত করে থাকে। ফলে স্বয়ং মানুষ নিজেকে পাপ ও দুর্ভাগ্য হতে নিষ্কৃতি দিয়ে মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়নি। একারণে আল্লাহ স্বয়ং সক্রিয় হয়েছেন এবং মানুষের ইতিহাসে হস্তক্ষেপ করেছেন। অর্থাৎ ঈশ্বর স্বয়ং দৈহিক ও বস্তুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন এবং মারঈয়ামের থেকে প্রসব লাভ করেছেন, যাতে দৈহিক অবয়বধারী ঈশ্বর ত্রিশ বছর বয়সে ইয়াহিয়া মুআম্মেদান এর মাধ্যমে বিশেষ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ধর্মের প্রচার শুরু করেন। তারপর তিন বছর ধর্মপ্রচার শেষে ইহুদি গণকদের মাধ্যমে আটক হন এবং বিচারের জন্য

১. The Fall of man

জেরুযালেমের শাসক Pilates এর কাছে নীত হন। অতঃপর তাঁকে মৃত্যুকাষ্ঠ ক্রুশের দিকে এগিয়ে দেওয়া হয়।

Pilates জ্যেষ্ঠ ইহুদি গণকবৃন্দ ও সমাবেত জনগণের দাবি অনুসারে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। এভাবে হযরত ঈসা'র মৃত্যুর ট্রাজেডি সংঘটিত হয় এক শুক্রবারের পড়ন্ত বিকেলে। আর যেহেতু শনিবার ছিল বন্ধের দিন, একারণে যে কতিপয় নারী ঈসা'র সাথে জেরুযালেমে এসেছিল, তারা রবিবারে বাজারে গিয়ে ঈসার কবরে সুগন্ধি ছিটানোর জন্য আতর সংগ্রহ করে আনে। কিন্তু যখন তারা ঈসার কবরের নিকটবর্তী হয়, তখন দেখতে পায় যে, কবরের মুখ উন্মুক্ত। আর কবরের অভ্যন্তরে ঈসার মরদেহ নেই।

প্রকৃতপক্ষে ঈসা তাঁর নিজের অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন এবং যেমনটা তিনি স্বীয় অনুচরদের বলেছিলেন, তিনি তৃতীয় দিনে ঊর্ধ্বগমন করেন এবং আসমানে নিজের পিতার কাছে প্রত্যাবর্তন করেন।

এ বিষাদময় ঘটনা ও ঐতিহাসিক ট্রাজেডি অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্রের হত্যা হওয়া ছিল আসলে একটি ফিদিয়া তথা বদলাস্বরূপ, যা ঈশ্বর পিতা স্বীয় অনাদি পরিকল্পনার আওতায় মানবজাতির মুক্তির স্বার্থে সম্পাদন করেছেন। অন্যভাবে বলা যায়, ঈসা নিজের হত্যা হওয়ার মাধ্যমে মানবজাতির সকল সত্তাগত পাপের কাফফারা পরিশোধ করেছেন। এ কারণে যে কেউ ঈসার প্রতি ঈমান আনবে, সে নাজাত লাভ করবে। আর নাজাত পাওয়ার জন্য এটাই একমাত্র উপায়।

খ্রিস্টানরা তাদের এ বিশ্বাসকে ঈসা'র বলে কথিত কিছু বাণী দ্বারা সনদযুক্ত বলে দাবি করে। নিউ টেস্টামেন্ট-এ ঈসার কথা থেকে উদ্ধৃত করে বর্ণিত যে, 'No one comes to the Father except through me' - 'আমার পথে ব্যতীত কেউই পিতার নিকট পৌঁছতে পারবে না।'[১]

১. যোহন, চ্যাপ্টার ১৪/৬

কিন্তু খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের কাছাকাছি সময়ে অনেক খ্রিস্টানই ঈসা মসীহ'র স্থলে চার্চের কথা উত্থাপন করে এবং বিশ্বাস করতে থাকে যে, চার্চের বাইরে কোন কিছুর অর্থ নেই।[১]

উপরিউক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী মানবজাতির মঙ্গল ও সৌভাগ্য শুধু চার্চের শিক্ষা গ্রহণ ও খ্রিস্টধর্ম অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভবপর। আর মানুষ স্বীয় কর্তব্য সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে ঐশী জীবনের প্রতি আশান্বিত হতে পারে এবং ঈশ্বর, ফেরেশতাকুল ও ঐশী বাসিন্দাদের পাশে জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে। অন্যথায় তাদের কপালে জুটবে চিরন্তন শাস্তি ও দুর্ভোগ।

মধ্যযুগে মানুষ ছাড়াও বস্তুজগৎ ও প্রাকৃতিক বিষয়গুলোকেও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হতো। প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ, যেমন বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় এবং একইভাবে মহামারী রোগব্যাধিসমূহকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হতো যে, এর কারণ ছিল এটা যে, মানব তার কর্ম ও আচরণে স্বীয় ধর্মীয় কর্তব্য পালন করত না এবং তারা পাপে লিপ্ত হতো। এ কারণে মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য ও কর্তব্য হচ্ছে বিশ্বকে জানা এবং ঐ সমস্ত রহস্যকে উদঘাটন করা, যা ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টির কাজে প্রয়োগ করেছেন যাতে এর মাধ্যমে ঈশ্বর-পরিচিতি সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

এক কথায় বলা যায়, জগতের সমস্ত মানবীয় ও প্রাকৃতিক দিক ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থ বহন করত এবং সকল প্রাকৃতিক ও মানবিক বিজ্ঞানই, যেমন অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, দর্শন ইতাদি সবই ধর্মীয় রং ও ঘ্রাণযুক্ত ছিল। কিন্তু ইত্যবসরে যে জিনিসটি মনোযোগ আকৃষ্ট করে তা হল 'পশ্চিমা পণ্ডিতবৃন্দের নিকট মধ্যযুগের সংস্কৃতি ও তৎকালীন চিন্তাধারাসমূহ Modern তথা আধুনিক বলে গণ্য হয় না কেন?'

কারো কারো ধারণা মতে উপরিউক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির উত্তর এটা হতে পারে যে, মধ্যযুগের সুদীর্ঘ কাল যা প্রায় দশ শতাব্দী যাবত প্রলম্বিত ছিল,[২] কিন্তু এ সময়ের মধ্যে কোন নতুন চিন্তাই আবির্ভূত হয়নি। বরং পরবর্তী সকল চিন্তাবিদই পূর্ববর্তী

১. Extra ecclesian nulla salus .PHilip L.QuiNN, Religious Pluralism, in Routledge Encyclopedia of philosophy, v.8, (ed. Edward craig, London and new yourk), 1998. pp. 4-260 .

২. দ্র. বার্ট্রা- রাসেল, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস

পণ্ডিতদের চিন্তাধারাকেই অনুসরণ ও অনুকরণ করে চলেছেন। এ কারণে মধ্যযুগকে 'আধুনিক যুগ' বলা হয় না।

কিন্তু এ ধরনের উত্তর যে নিতান্তই হালকা এবং ঘটনার গভীরতায় প্রবেশ না করেই দেওয়া হয়েছে তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন পড়ে না। কারণ, এটা বিশ্বাসযোগ্য কথা হতে পারে না যে, সুদীর্ঘ দশ শতককাল যাবৎ একটি জাতির মধ্যে (যার মধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল) কোনই নতুন চিন্তা প্রকাশ পাবে না। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণও এহেন দাবিকে নাকচ করে দেয়। ত্রয়োদশ শতকে মধ্যযুগীয় দর্শনচিন্তা বিশেষ করে কালামশাস্ত্রীয় চিন্তাধারার পথ ধরে টমাস এ্যকুনাস এর ন্যায় মহান পণ্ডিত ব্যক্তিত্বদের আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা পূর্ববর্তী চিন্তাবিদদের তুলনায় নতুন নতুন কালামশাস্ত্রীয় চিন্তার উন্মেষ ঘটান।

এছাড়া খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের সূচনায় ইসলামের আবির্ভাব ঘটে এবং মানবজাতির কাছে নতুন সভ্যতা উপহার দেয়। যা এমনভাবে বিস্তার লাভ করে যে, এমনকি ইউরোপে প্রবেশ করে সেখানকার জনপদকে ইসলামী সভ্যতার সাথে পরিচিত করে তোলে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ সভ্যতা ছিল সম্পূর্ণরূপে নতুন এক সভ্যতা এবং যা ছিল ইহুদি ও খ্রিস্টীয় শিক্ষা হতে ভিন্ন। একারণে উল্লিখিত প্রশ্নটি চিন্তাবিদদের মন-মস্তিষ্ককে সত্যিকার এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে। অর্থাৎ তাহলে কেন মধ্যযুগীয় নতুন চিন্তাধারা এবং একইভাবে ইসলামী চিন্তা-দর্শনের ওপর 'Modern' (আধুনিক) কথাটি প্রয়োগ করা হয় না?

উপরিউক্ত এ প্রশ্নের প্রতি যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করা হয় এবং পশ্চিমা পণ্ডিতবর্গ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে উত্তর প্রদান করে থাকেন সেটা যদি একবার যাচাই করে দেখা হয়, তাহলে প্রতীয়মান হবে যে, পশ্চিমা চিন্তাবিদদের ও আধুনিক বিশ্বের দৃষ্টিতে যে কোন নতুন বিষয় ও যে কোন নতুন চিন্তাই Modern (আধুনিক) নয়; বরং একটি চিন্তা তখনই আধুনিক হবে যখন তা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে। আর ঐ বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি হল ধর্মের সাথে তার কোন সংশ্রব না থাকা। অর্থাৎ ধর্ম ও অনুরূপ কোন কিছুর বন্ধন হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে হবে। যতক্ষণ অবধি চিন্তার ওপর ধর্মীয় ও ঐশী প্রত্যাদেশের শাসন থাকবে ততক্ষণ তা আধুনিক বলে গণ্য হবে না। যতই তা তদ্‌পূর্ববর্তী চিন্তাবিদদের চিন্তাধারা হতে নবতর ও অভিনব হোক না কেন।

আর এ কারণেই ইসলামের নতুন সভ্যতা যা সপ্তম শতকে মানবজাতির জীবনে আবির্ভূত হয়, কোনক্রমেই তা আধুনিক ও অভিনব হতে পারে না।

অতএব, একটি আধুনিক সংস্কৃতি কিংবা চিন্তার মূল স্বরূপ হল এটা যে, উক্ত সংস্কৃতি কিংবা চিন্তা কোনক্রমেই ধর্মীয় শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারবে না এবং যে কোন প্রকার ধর্মীয় বন্ধন হতে মুক্ত থাকতে হবে। যেমনটা Modernity and Religion গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক লিখেছেন : 'আধুনিক বিশ্ব তখনই শুরু হয়েছে যখন মানুষ নিজেকে ধর্মের প্রভাব হতে মুক্ত করতে প্রচেষ্টা চালিয়েছে।'[১]

প্রকৃতপক্ষে আধুনিক মানুষ হচ্ছে এমন একজন মানুষ যে একজন ধর্মানুরাগী ও অ-আধুনিক মানুষের বিপরীতে নিজের হাতে একটি ধারালো ছুরি তুলে নিয়েছে এবং একদিক হতে নিজের উৎপত্তি ও উৎসের সাথে বন্ধনকে কেটে ফেলেছে, অপরদিক হতে পরকালের সাথে তার বন্ধনেও ছুরি চালিয়েছে। ফলে একজন আধুনিক মানুষের দৃষ্টিতে যে জিনিসটি মানুষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়ার উপযুক্ত অর্থাৎ যার জন্য মানুষ তার সমস্ত চেষ্টা ও প্রয়াসকে নিয়োজিত করতে পারে, সেটা হচ্ছে স্রেফ এই বস্তুজগৎ, অন্য কিছু নয়।

মানুষের উচিত এ দুনিয়াতেই তার জীবনকে সমৃদ্ধ করা এবং এ পার্থিব জীবনের পথে যা কিছুই তার সুখ-সমৃদ্ধির স্বার্থে অনুকূল হবে তা থেকে উপকার গ্রহণ করা। এ কারণেই তাকে প্রকৃতির খোঁজে বের হতে হবে এবং অন্যান্য যা কিছু তার স্বার্থে উপাদেয় হবে তার কাছে যেতে হবে। অতঃপর সেসবের সাথে ভালোরূপে পরিচিত হতে হবে। কিন্তু প্রথমত অন্য কোন জ্ঞানের উৎস, যেমন ঐশী গ্রন্থ 'কিতাবুল মুকাদ্দাস'-এর শরণাপন্ন হওয়া চলবে না; বরং শুধু ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণ ও বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের ওপরেই নির্ভর করতে হবে। সেক্ষেত্রে কোন জ্ঞান-পরিচিতিই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। কেউই ভ্রান্তিমুক্ত বলে দাবি করতে পারবে না। তাছাড়া যে কোন দাবির বিষয়ে সঠিক জ্ঞান-পরিচিতি অর্জনের জন্য তার কারণ ও ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে উন্মুক্তরূপে পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান করার অবকাশ থাকবে। একারণে কোন দাবি যদি গায়েবী বিষয়াদিনির্ভর ও তার সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে তা মূল্যহীন।[২]

---

১. RALPH MCINERNY, Modernity and Religion, (London), 1994. p.ix .

২. Paul Kurtz, toward a new Enlighttenment. (Ed, by Vern L. Bullough and timoth J. madigan), 1994, P.51 .

মোটকথা ইন্দ্রিয় ও অভিজ্ঞতানির্ভর বুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞানের কোন নির্ভরযোগ্য উৎস নেই। আর বহির্জগতেও বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সমূহের সহায়তায় মানুষের বুদ্ধি যা কিছুর (অস্তিত্ব) প্রমাণ করে তার বাইরে অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই।[১]

দ্বিতীয়ত, জগতের গঠন-কাঠামোয় বিদ্যমান ভেদসমূহের রহস্য উদ্ঘাটন করা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয় যে, আমরা এর মাধ্যমে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করব। বরং জ্ঞান-বিজ্ঞান হচ্ছে সেটাই যা আমাদের মধ্যে প্রকৃতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার ও প্রকৃতিকে আয়ত্তাধীন করার সামর্থ্য সৃষ্টি করে, যাতে এর মাধ্যমে আমরা নিরিবিলি ও নিশ্চিন্ততর জীবন লাভ করতে পারি। এভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল্য দাঁড়ায় একটি 'উপকরণ' এর সমান।[২]

ব্যবহারিক আচরণে এবং জীবনের চলার আদর্শ ও মূল্য নির্ধারণেও মানুষের শুধু নিজের ওপরেই নির্ভর করতে হবে। অন্য কোন অস্তিত্বসত্তা কিংবা অন্য কোন ধর্মীয় জ্ঞানতাত্ত্বিক উৎস মানুষের জীবনের মূল্যসমূহ নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে না। আর যদিও মানুষের তার মূল্যবোধসমূহের নিরূপণ কার্যে ভ্রান্তি করার সম্ভাবনাও রয়েছে, কিন্তু তাই বলে এরূপ ভ্রান্তির সম্ভাবনা বাহির থেকে কারও জন্য মানুষের জীবনে দিক ও মূল্যসমসূহ র্নিধারণ করে দেওয়ার আবশ্যকতা ও বৈধতা প্রদান করে না।[৩] অন্য কথায় বলা যায়, 'মানুষই সব কিছুর মাপকাঠি (অর্থাৎ Humanism)'।

মানুষকেন্দ্রিক হয়ে পড়া আধুনিক বিশ্ব সর্বপ্রকার অবস্তুগত ও অতি-প্রাকৃতিক অস্তিত্বকে নাকচ করার মাধ্যমে একদিকে যেমন মানুষের অদৈহিক আত্মাকে নাকচ করে দেয়, অপরদিকে তেমনি মানুষের জন্য তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সকল দিকের মানদণ্ড ও মাপকাঠি নির্ধারণে প্রয়াসী হয় এবং এক্ষেত্রে নিজের বুদ্ধি ব্যতীত আর কোন কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী হয় না। অর্থাৎ আধুনিক মানুষ বিশ্বাস করে মানুষের জীবনের তাত্ত্বিক কিংবা ব্যবহারিক কোন অঙ্গনেই ধর্ম কিংবা ধর্মীয় শিক্ষার হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। আরেকটি বিষয় হল সবকিছুই যেন ইহজাগতিক ব্যাখ্যা লাভ করে (অর্থাৎ Secularism)।

---

১. Hussain nassr, Traditional Islam in the modern world, (London and new york). 1987. P. 101 .
২. West David, An Introduction to continental philosophy, (First Published by polity press). 1996, P. 13 .
৩. Will Kymlicka, liberalism, community and culture, (Oxford, new york), 1989, PP. 12-13 .

সুতরাং উদাহরণস্বরূপ নৈতিক ও চারিত্রিক মাপকাঠি নির্ধারণেও মানুষকে কেবল নিজের বস্তুগত ও পার্থিব লাভকেই বিবেচনা করতে হবে। সেদিক দিয়ে মানুষ হবে নিছক একটি বস্তুগত ও পার্থিব অস্তিত্বসত্তা, অতিপ্রাকৃতিক উৎসমূল কিংবা পারলৌকিক পরিণতির সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। তখন মানুষ তার বিবেচনা ও নির্ণয় শক্তি দ্বারা যা কিছুকে ভালো মনে করবে ও কামনা করবে সেটাই শুভ ও ভালো। আর যা কিছুকে অপছন্দ ও ঘৃণা করবে সেটাই মন্দ। অন্য কথায় বলা যায়, মানবের কামনা ও আকাঙ্ক্ষাই হবে ভালো ও মন্দ নির্ণয়ের এবং সকল নৈতিক মূল্যবোধ নিরূপণের সূচক। যেমনটা বেনথাম এ সম্পর্কে বলেন : 'ভালো হচ্ছে যেটা চাওয়া হয় আর মন্দ হচ্ছে যেটা চাওয়া হয় না।' [১]

এ কারণেই কিছু কিছু আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজে সমকামিতার মতো একটি জঘন্য কাজও কোন নৈতিকতা পরিপন্থী ও মন্দ কাজ হিসাবে পরিগণিত হয় না। কারণ, মন্দ কাজ হল সেই কাজ যা উক্ত কাজের কর্তার কাছে ঘৃণ্য হবে এবং কর্তা তা (করতে) চাইবে না। কিন্তু যখন কোন এক বা একাধিক কর্তা উক্ত কাজ (করতে) চায় কাজেই তা একটি ভালো কাজ হিসাবে পরিগণিত। বলা বাহুল্য, এহেন মাপকাঠির ভিত্তিতে কোন কাজ যত কুৎসিত ও নোংরাই হোক না কেন, যদি কারো চাওয়া ও কামনার পাত্র হয় তাহলে সেটা একটি ভালো কাজ হিসাবে গণ্য হবে, যতক্ষণ না সেটা অন্যের স্বাধীনতার জন্য হানিকর হয়। সে কাজটি সম্পূর্ণরূপে একটি মানবতাবিরোধী ও শতভাগ একটি পাশবিক কাজই হোক না কেন।

মোটকথা ফলাফলে এসে দেখা যাচ্ছে, আধুনিক বিশ্ব তখনই সূচনা হয়েছে যখন মানুষ ও তার কামনা ও বাসনাগুলোই গোটা বিশ্বজগতের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। আর মানবের সকল চেষ্টা ও প্রয়াসও একটি 'উপকরণ' এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে মাত্র, যার উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক জগতের ওপর যত বেশি সম্ভব কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা ও আরো অনায়াস জীবন যাপন নিশ্চিত করা। এক কথায় বলা যায়, মানুষের বস্তুগত কামনা-বাসনাগুলোর যতবেশি চাহিদা পূরণ করে পারা যায়। তবে মানব জীবনের কোন অঙ্গনেই ধর্মীয় ও অতিপ্রাকৃতিক শিক্ষার কোনরূপ হস্তক্ষেপ থাকবে না। কাজেই Modern বা আধুনিক হওয়ার অর্থ ধর্মকে বর্জন করা এবং ধর্মাচার,

১ The Rise and Decline of Western Liberalism by ARBLASTER (20 Feb 1986)

ঈশ্বর, স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ ও পরকাল হতে বিমুক্ত হওয়া। আর একারণেই সব চিন্তা ও বিষয়ই Modern (আধুনিক) নয়।

অতএব, যদি কোন চিন্তা ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত থাকে, তাহলে এমনকি অতীতে যদি তার কোন নজির নাও থেকে থাকে, বরং বর্তমান কালেই তা উত্থাপিত হয়ে থাকে, তবুও সেটা একটি প্রচলিত (Traditional) চিন্তা বলে গণ্য হবে। কোন মতেই তা আধুনিক চিন্তা হবে না। পক্ষান্তরে যদি কোন চিন্তা মানুষ ও বস্তুজগতকে সবকিছুর মূলকেন্দ্র হিসাবে নির্ধারণ করে এবং মনুষ্য ইন্দ্রিয়নির্ভর বুদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় (যা যে কোন প্রকার ধর্মীয় বা অ-ধর্মীয় বহিঃপ্রভাব হতে মুক্ত), তাহলে তা একটি আধুনিক চিন্তা হিসাবে পরিগণিত হবে। যদিও তা বহুকাল আগে থেকেই বিরাজমান। উদাহরণস্বরূপ, মানুষকেন্দ্রিকতার চিন্তাটি আনুমানিক দুই হাজার ছয়শ' বছর পূর্বে গ্রীক Sophist-দের দ্বারা উত্থাপিত হয়েছিল। এ মর্মে Protagoras এর বিখ্যাত উক্তি হল : 'মানুষই সবকিছুর মাপকাঠি।'[১] এতদসত্ত্বেও এ চিন্তাটি একটি আধুনিক চিন্তা হিসাবে পরিগণিত এবং আধুনিক বিশ্বের বিশ্বদৃষ্টি কর্তৃক এটা পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে সমকামিতা, যা আধুনিক বিশ্বে একটি গ্রহণযোগ্য কাজ হিসাবে গণ্য করা হয় (এবং যা আধুনিক হওয়ার পরিপন্থী নয়), এটি এমন একটি কাজ পবিত্র কোরআনে যেটাকে হযরত লূত (আ.)-এর জাতির আচরণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কয়েক হাজার বছর পূর্বে প্রচলিত একটি কাজ।[২]

ওপরের বিষয়সমূহের প্রতি মনোযোগ সহকারে চিন্তা করলে এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কোন আচরণের নতুন বা পুরাতন হওয়াটা তা Modern হওয়া না-হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে না; বরং এক্ষেত্রে মাপকাঠি হচ্ছে যা কিছু মনুষ্য নয় তা (যেমন ঈশ্বর, ধর্ম, অন্যান্য রীতি প্রথা) হতে বিচ্ছিন্নতা। আর মানুষ ও তার কামনা-বাসনাকে কেন্দ্র হিসাবে নির্ধারণ। এককথায় আধুনিক বিশ্ব অর্থাৎ স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের সারসত্যে ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের স্থলে মনুষ্য বুদ্ধি ও জ্ঞানে বিশ্বাস।

১. ফ্রেডরিক ক্যাপলস্টন - গ্রীক ও রোমান দর্শনের ইতিহাস, (ফার্সী অনুবাদ), পৃ : ১০৬
২. আনকাবুত : ২৮-৩৫

২. Modernity বা আধুনিকতা : অভিধানে এ কথাটির অর্থ নতুন হওয়া বোঝালেও পরিভাষায় এর বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এখানে সেসব সংজ্ঞার মধ্যে কয়েকটি সংজ্ঞা তুলে ধরা হল :

ক. Modernity হল এ বিশ্বাস যে, মানুষ হল একটি স্বাধীন, মুক্ত ও বুদ্ধিসম্পন্ন অস্তিত্বসত্তা, যে নিজেই নিজের ভাগ্য-পরিণতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।[১]

খ. Modernity অর্থাৎ প্রচলিত রীতি-প্রথায় (যেমন কল্পকাহিনীপ্রসূত, ধর্মীয়, নৈতিক, দার্শনিক ইত্যাদি রীতি-প্রথা) বিশ্বাসের ওপর মনুষ্য বুদ্ধি তথা যুক্তির বিজয়, বৈজ্ঞানিক চিন্তাচেতনা ও যুক্তি-বিশ্বাস[২] বৃদ্ধি, উৎপাদন ও বাণিজ্যের নতুন প্রাতিষ্ঠানিকতা বিধান সহকারে সমালোচনামূলক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া, পণ্যসমূহের বিনিময় আইনের কাঠামো গড়ে ওঠা এবং ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রের ওপর নাগরিক সমাজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার যুগ।[৩]

আবার এভাবেও Modernity'র সংজ্ঞা দেওয়া যায় : 'Modernity বলতে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে এমন এক পরিবর্তন ও বিবর্তনের ধারাকে বুঝায় যা মানুষ ও তার সর্বমুখী মুক্তিকে কেন্দ্র করে চলে। তদ্রূপ যা মনুষ্য বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যতায় বিশ্বাস করার মাধ্যমে প্রাকৃতিক, অতিপ্রাকৃতিক, মূল্যবোধসমূহ ইত্যাদি সমস্ত কিছুর বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছে। আর মানুষের সর্বাঙ্গীন জীবনে পরিবর্তন সাধন ও স্থায়ীভাবে নতুন করে দেওয়ার চিন্তা থেকে যা কিছুই তার বিপরীতে অবস্থান করে (যেমন ধর্ম, রীতি-রেওয়াজ ও অন্য প্রচলনসমূহ) সেগুলোকে নাকচ করে দেয়।

৩. Modernism বা আধুনিকতাবাদ : অভিধানে এ কথাটির অর্থ নতুনের প্রতি আগ্রহ ও ঝোঁক। আর এর পারিভাষিক অর্থ হল এমন এক বিশ্বদৃষ্টি যার ভিত্তিতে Modernity বা আধুনিকতা ও তার গঠন উপাদানসমূহ ব্যাখ্যায়িত হয়। পশ্চিমা পণ্ডিতবৃন্দের ভাষায় এ বিশ্বদৃষ্টির যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

---

১. Alex Inkeles, Amodel of modern man, in Modernity critical concepts, v.2, (Routledge). 1999, P.1 .

২. rationality

৩. ববাক আহমাদি, মডার্নিটি ও সমালোচনামূলক চিন্তা, (মূল ফারসি) পৃ. ৯-১১

ক. জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে : Observationalistic (পর্যবেক্ষণমূলক), Experimentalistic (পরীক্ষণমূলক) এবং Empiristic (অভিজ্ঞতামূলক)। অন্য কথায় যা প্রত্যক্ষণ, পরীক্ষণ ও বাহ্যিক ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকেই সত্য জ্ঞানে পৌঁছানোর একমাত্র পথ হিসাবে মনে করে থাকে।[১]

খ. শুধু বুদ্ধিকেই যুক্তি-প্রমাণের উপকরণ হিসাবে মনে করে।[২] এ বুদ্ধির একমাত্র যে কাজ তা হল প্রত্যক্ষণ, পরীক্ষণ ও ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাসূত্রে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তকে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণের ফর্মুলায় নীত করে নতুন কোন ফলাফল উপস্থাপন করা যাতে জগৎ সম্পর্কে পরিচিত হওয়ার মাধ্যমে এর ঘটনাবলির ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করার চেষ্টা করে এবং তদনুযায়ী প্রাকৃতিক জগতকে আয়ত্তাধীন ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।[৩] একারণে এরূপ বুদ্ধি তার অন্তর্নিহিত পরিচয়ে ব্যবহারিক বুদ্ধিই বটে।

গ. বস্তুবাদমুখী (Materilistic) অর্থাৎ বস্তুজগতের বাইরে আর কোন জগৎ বা জগতসমূহে বিশ্বাসী নয়।[৪] এরূপ বস্তুকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি অবশ্য উপরিউক্ত দুইটি বৈশিষ্ট্যের অবধারিত ফলাফল। কেননা, যেহেতু শুধু পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই সত্য জ্ঞানে পৌঁছানো সম্ভব এবং বুদ্ধিরও যেহেতু এ পথে যেসব তথ্য কাঁচামাল হিসাবে পাওয়া যায় সেগুলোকে সুবিন্যস্ত করা ব্যতীত অন্য কোন কাজ নেই, ফলে স্বভাবতই ক্রমান্বয়ে এ বিশ্বাস পোষণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না যে, যা কিছু প্রত্যক্ষণ, পরীক্ষণ ও অভিজ্ঞতাযোগ্য নয়, তার অস্তিত্বও নেই। অথবা কমপক্ষে নিরীশ্বরবাদ (Atheism) কিম্বা অজ্ঞেয়বাদ (Agnosticism) জন্ম নেয়।

ঘ. মানবকেন্দ্রিক (Humanistic) অর্থাৎ মানবের সেবাই একমাত্র ও সর্বপ্রথম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে মনে করে। অন্যকথায় মনুষ্যত্বকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করে এবং বিশ্বাস করে যে, সবকিছুই ও সব কাজই হতে হবে মানুষের সেবায় নিয়োজিত।[৫]

---

১. বার্ট্রান্ড রাসেল, প্রাগুক্ত
২. Rationalism তথা যুক্তিবাদ
৩. Hussain Nassr, ibid .
৪. Paul Kurtz, ibid, P.P 1-50
৫. Tony Davies, Humanis, (First Published, London and new york), 1997, P.105

ঙ. মুক্তচিন্তা চর্চা (Free thinking)। অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তির ব্যাপারে যে কোন ধরনের অন্ধভাবে মান্য তথা আনুগত্য করার বিরোধী এবং কাউকেই প্রশ্নের ঊর্ধ্বে বলে মনে করে না। আর প্রত্যেকের থেকেই যুক্তি ও প্রমাণ দাবি করে।[১]

চ. নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে : আবেগপ্রবণ (sentimentalistic)। অর্থাৎ আবেগ ও অনুভূতিকেই সকল নৈতিক কর্ম-উদ্দীপনার উৎস এবং সকল নৈতিক ভালো-মন্দের একমাত্র বিচারক হিসাবে মনে করে।

৪. **Modernization (আধুনিকীককরণ) :** যে সমস্ত সমাজে আধুনিকতার পরিকাঠামো ও সংস্কৃতি বিদ্যমান নেই সেখানে তা প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জ্ঞাতসারে ও স্বাধীন কর্মতৎপরতাকেই মডার্নাইজেশন তথা আধুনিকীকরণ বলা হয়। আধুনিকীকরণ সম্পন্ন করার কর্মকাণ্ড ও প্রক্রিয়ায় পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্থাসমূহের অগ্রসর ও জটিলতর মডেলকে সামনে রেখে অনুন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে পরিবর্তন সাধনের দরকার হয়। সমাজবিজ্ঞানের থিওরিসমূহের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়ার ওপর স্টাডি ও সূক্ষ্মভাবে সংজ্ঞায়নের প্রয়াস চালানো হয়েছে। উক্ত থিওরিসমূহের ভিত্তিতে বিভিন্ন সমাজকে দুই প্রকারে বিভক্ত করা হয়েছে :

একটি হচ্ছে Traditional Society (প্রচলিত সমাজ)। অন্য ভাষায় যাকে বলা যায় 'গ্রাম্য', 'অনগ্রসর' কিংবা 'পশ্চাদপদ' সমাজ। আর অপরটি হচ্ছে Modern Society (আধুনিক সমাজ)। অন্য ভাষায় যাকে বলা যায় 'নগরায়িত', 'অগ্রসর' কিংবা 'শিল্পোন্নত' সমাজ। তদ্রূপ এসব থিওরি অনুসারে বিভিন্ন সমাজের সামাজিক পরিকাঠামো বিশেষ সাদৃশ্যপূর্ণ ও সর্বজনীন আইন-কানুনের ভিত্তিতেই এগিয়ে চলছে এবং সর্বদা অগ্রসরমান ধারার অধিকারী। আর একারণে সকল সমাজই প্রায় একইরকম ঐতিহাসিক অভিযাত্রার (অর্থাৎ এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে উত্তরণ) অনুগমন করে থাকে। এ তত্ত্বের ভিত্তিতে এমনটা ধারণা করা হয়েছে যে, Traditional Society গুলোর উচিত ঐসব মডেল অনুসরণ করা, যা পশ্চিমা সমাজসমূহ বাস্তবায়ন করেছে। বাস্তবিকপক্ষে আধুনিকীকরণের থিওরিসমূহ পাশ্চাত্য সমাজসমূহের সংস্থাগুলোকে ও এসমস্ত শিল্পোন্নত সমাজের পরিবর্তনগুলোকে নির্দিষ্ট

১. John mon Fasani, Humanism Renassance, in Encyclopedia of philosophy, v4, (Routledge, London and new york), 1998, PP. 30-599

করার প্রয়াস চালায় যাতে অনুন্নত দেশসমূহে সেগুলোকে বাস্তবায়ন করতে পারে। অর্থাৎ Modernization = Westernization[১] এ কারণে আধুনিকীকরণের মৌলিক প্রকল্পগুলো হচ্ছে :

1. Secularism (ধর্মবিবর্জিত জীবন ব্যবস্থা)

2. Materialism (বস্তুবাদিতা)

3. Individualism (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ)

4. Science and technological development (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নয়নে বিশ্বাস)[২]

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

এ পর্যায়ে সংক্ষেপে কেবল ইসলাম ধর্মের কয়েকটি কাঠামো ধারার প্রতি ইশারা করা হল :

১. ইসলাম ধর্মে আল্লাহকে এক অতিপ্রাকৃতিক ও অজড় অস্তিত্বসত্তা হিসাবে বিশ্বাস করা হয়, যিনি বিশ্বজগতের একমাত্র স্রষ্টা এবং নিরঙ্কুশভাবে অভাবমুক্ত। আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়টি সংশয়াতীত।

পবিত্র কোরআন মহানবীর বক্তব্য হতে বর্ণনা করে

قالت رسلهم افى الله شك فاطر السموات و الارض

'তাদের নবীরা (তাদের উত্তরে) বলেছিল, সেই আল্লাহ সম্পর্কেও কি সন্দেহ (কর), যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা?'[৩]

২. বিশ্বজগতের একটি 'তাঁর থেকেই তুমি' ধরনের পরিচয়সত্তা রয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বজগতের প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে 'তাঁরই থেকে'। পার্থক্য রয়েছে কোন জিনিস 'নিজে নিজের থেকে' হবে, তার বাস্তবতার সম্পূর্ণটা 'তারই থেকে তুমি' ধরনের হওয়া ব্যতিরেকে। যেমন পিতামাতার সাথে সন্তানের সম্পর্কের বিষয়টি। সন্তান

১. John L. Esposito, Islam and secularism, the Twenty - First century, (new york university press), 2000,p.1
২. Louis J.contor, modernization and Development, in the Oxford Encyclopedia of the modern Islamic world, v.3 (ed. John .Esposito, New York - Oxford), 1995, P.123
৩. ইবরাহীম : ১০

তাদেরই থেকে বটে। তবে সন্তানের অস্তিত্বের বাস্তবতাটি পিতামাতার সাথে তার সম্পর্কগত বাস্তবতা থেকে আলাদা (তথা স্বাধীন)। কিন্তু বিশ্বজগতের একটি পরিচয়সত্তা রয়েছে 'তাঁর থেকেই তুমি' ধরনের। অর্থাৎ বিশ্বজগৎ তার অস্তিত্বের সমস্ত বাস্তবতা জুড়ে স্রষ্টার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তার বাস্তবতা আর স্রষ্টার সাথে তার সম্পর্কযোগ একই কথা। আসলে 'মাখলুক' তথা 'সৃষ্ট'র অর্থ এটাই।

একইভাবে এ বিশ্বজগতের রয়েছে 'তাঁরই দিকে' ধরনের পরিচয় সত্তা। অর্থাৎ যেমনভাবে সে 'তাঁরই থেকে', তদ্রূপ 'তাঁরই দিকে'ও বটে। কাজেই এ বিশ্বজগৎ তার সমগ্রসত্তায় যেমন এক অধঃগামী পরিভ্রমণ অতিক্রম করেছে। একইভাবে তাঁর দিকে এক ঊর্ধ্বগামী পরিভ্রমণও অতিক্রমরত অবস্থায় রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে : انا لله و انا اليه راجعون : 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তশীল।'[১] অন্যত্র এসেছে : الا الى الله تصير الامور : 'একমাত্র তাঁর দিকেই সমুদয় বিষয়ের প্রত্যাবর্তন।'[২]

৩. বিশ্বজগৎ সুদৃঢ় এক কার্যকারণ নিয়মের অধিকারী। যে কোন সৃষ্টিসত্তার প্রতি ঐশ্বরিক কৃপা এবং তাঁর অলঙ্ঘনীয় লিখন কেবল কার্যকারণের বিশেষ পথ ধরেই প্রবহমান। তাছাড়া কার্যকারণের এ নিয়ম কেবল দৈহিক ও বস্তুগত কার্যকারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্বজগৎ তার বস্তুগত দিকে বস্তুগত কার্যকারণের নিয়মের অধিকারী। আর তার অপার্থিব ও আধ্যাত্মিক দিকে অবস্তুগত কার্যকারণের নিয়মের অধিকারী। আবার এ দুই প্রকারের কার্যকারণ নিয়মের মধ্যে কোন বৈরিতাও নেই। প্রত্যেকেই স্ব স্ব অস্তিত্বমানে প্রতিষ্ঠিত। ফেরেশতাগণ, আত্মা, লওহ ফলক, কলম, ঐশীগ্রন্থসমূহ ইত্যাদি বিষয়গুলো হচ্ছে সেই বিষয়, যার মাধ্যমে আল্লাহরই অনুমতিক্রমে তাঁর করুণা ঝরে থাকে।

৪. গোটা বিশ্বজগৎ আপাদমস্তক একটি নিয়ন্ত্রিত তথা (হেদায়াতকৃত) বাস্তবতার নাম। এর প্রতিটি অনুকণা যে পর্যায়েই অবস্থান করুক না কেন, তা নিয়ন্ত্রণ ও সুপরিচালনার সুতোয় গাঁথা। স্বভাব, ইন্দ্রিয়-অনুভব, বুদ্ধি, ইল্‌হাম, ওহি ইত্যাদি সবই হচ্ছে বিশ্বজগতের সেই সর্বজনীন হেদায়াতের বিভিন্ন পর্যায় মাত্র। ইরশাদ হচ্ছে : قال ربنا الذى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى : '(মূসা ফিরআউনকে বলল)

১. বাকারা : ১৫৬
২. শুরা : ৫৩

আমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি সবকিছুকে তার সৃষ্টি দান করেছেন, অতঃপর তাকে পথনির্দেশ করেছেন।'[১]

৫. ইহজগতের পরে আরেকটি জগৎ আছে, পরকাল। সে জগৎ চিরন্তন এবং কর্মের প্রতিদান ও প্রতিফলের জগৎ। পবিত্র কোরআনের দুই সহস্রাধিক আয়াতে অর্থাৎ সমুদয় কোরআনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আয়াতে পরজগতের অস্তিত্ব ও পরিচয় বর্ণনা করে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন সংশয়ের অপনোদন করা হয়েছে। কোরআনের কোন কোন আয়াতে মহানবীকে এমর্মে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যেন কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে তিনি কসম করেন। ইরশাদ হচ্ছে :

زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبۡعَثُواْۚ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبۡعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلۡتُمۡۚ

'অবিশ্বাসীরা ধারণা করে তারা কখনোই পুনরুত্থিত হবে না। তুমি বল, হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর অবশ্যই তোমরা যা করেছ সে সম্বন্ধে তোমাদের অবহিত করা হবে।'[২]

৬. ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হল মানুষ অজড় আত্মার অধিকারী। ইরশাদ হচ্ছে :

وَقَالُوٓاْ أَءِذَا ضَلَلۡنَا فِي ٱلۡأَرۡضِ أَءِنَّا لَفِي خَلۡقٖ جَدِيدِۭۚ بَلۡ هُم بِلِقَآيِٕ رَبِّهِمۡ كَٰفِرُونَ ۝١٠
۞ قُلۡ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلۡمَوۡتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمۡ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ تُرۡجَعُونَ ۝١١

'তারা বলে, আমরা যখন মাটিতে বিলীন হযে যাব তখন কি আমরা নতুন করে সৃষ্ট হব? বরং তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে। তুমি বল, মৃত্যুর ফেরেশতা– যাকে তোমাদের ওপর নিযুক্ত করা হয়েছে, সে তোমাদের প্রাণ পূর্ণরূপে গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হবে।'[৩]

মানুষের আত্মা হচ্ছে এক চিরন্তন সারসত্যের নাম। মানুষ যে শুধু কিয়ামতে জীবিতরূপে পুনরুত্থিত হবে, তা নয়; দুনিয়া ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী সময়কালে 'বারযাখ' নামক একপ্রকার জীবন লাভ করবে। সেখানে পার্থিব জীবনের চাইতেও

১. ত্বাহা : ৫০
২. তাগাবুন : ৭
৩. সাজদাহ্ : ১০-১১

শক্তিশালী ও সম্পূর্ণতর এক জীবন উপভোগ করবে। পবিত্র কোরআনে আনুমানিক দুইশ আয়াতে মানুষের মৃত্যু থেকে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত সময়ে দেহের পচন অবস্থায় এক জীবনের কথা নির্দেশ রয়েছে।[১]

৭. মানুষের পার্থিব কার্যকলাপ ও আচরণের সাথে তার পারলৌকিক জীবনের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَٰطَتۡ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٨١﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٨٢﴾

'হ্যাঁ, যে মন্দ কর্ম করে এবং তার দোষ-ত্রুটি তাকে পরিবেষ্টন করে, সুতরাং তারাই হল জাহান্নামী এ অবস্থায় যে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ তারাই জান্নাতবাসী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।'[২]

৮. মানুষের আক্‌ল তথা বুদ্ধি এ দুনিয়ায় তাকে হেদায়াত ও সুখি সমৃদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট নয়। এ কারণে তার নবীর প্রয়োজন রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِۚ وَمَا ٱخۡتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۖ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلۡحَقِّ بِإِذۡنِهِۦۗ وَٱللَّهُ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

'(প্রথমে) সকল মানুষই একই জাতিভুক্ত ছিল। পরে (পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হল), তখন আল্লাহ (মুক্তির) সুসংবাদদাতা এবং (শাস্তির) সতর্ককারীরূপে নবিগণকে প্রেরণ করলেন এবং তাদের সাথে সত্যগ্রন্থ অবতীর্ণ করলেন; যাতে যেসব ব্যাপারে (মানুষ) মতবিরোধ করেছিল (এ গ্রন্থ) তার মীমংসা করে দেয়। এবং যাদের তা দান করা

১. উপরিউক্ত ৬ টি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে শহীদ মূর্তজা মোতাহহারীর লেখনীর সহায়তা নেওয়া হয়েছে।
২. বাকারা : ৮১-৮২

হয়েছিল, মতভেদ কেবল তারাই করেছিল, তাদের কাছে (আল্লাহর) সুস্পষ্ট বিধান এসে যাওয়ার পরও, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান (হিংসা ও) অন্যায়ের কারণে। তখন আল্লাহ নিজ অনুমতিক্রমে (বিশুদ্ধ) বিশ্বাসীদের সেই বিষয়ে পথ প্রদর্শন করলেন যে সত্য বিষয়ে তারা বিভেদ সৃষ্টি করেছিল। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথের নির্দেশনা দান করেন।'[১]

অন্যত্র কোরআন মানুষের ওপর ওহি অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করার পরিণাম 'আল্লাহকে জানতে না পারা' বলে উল্লেখ করেছে। ইরশাদ হচ্ছে :

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَىْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنتُمْ وَلَآ ءَابَآؤُكُمْ ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾

'এবং তারা (ইয়াহুদিগণ) আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি, যখন তারা বলল, আল্লাহ কোন মানুষের প্রতি কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি। তুমি বল, সেই গ্রন্থ কে অবতীর্ণ করেছিলেন যা মূসা নিয়ে এসেছিল? যা এক জ্যোতি ও মানুষের জন্য পথনির্দেশক ছিল?'[২]

৯. উপরিউক্ত বিষয়সমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সৌভাগ্যবান হওয়া এবং অজ্ঞতা, ভ্রষ্টতা আর কু-প্রবৃত্তি ও শয়তানি দাসত্ব হতে মুক্তির জন্য মানুষকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং নামায, রোযাসহ সমুদয় খোদায়ী নির্দেশ পালন করতে হবে। আর নৈতিকতা ও চারিত্রিক ক্ষেত্রেও খোদায়ী মূল্যসমূহের অনুগামী থাকতে হবে– স্বীয় কামনা-বাসনার অনুসরণ নয়।

এক কথায় বলা যায়, মানুষ যাতে পশুর স্তর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে এবং প্রকৃত মানুষে পরিণত হতে পারে সেজন্য ইসলামে সৌভাগ্যের সোপানস্বরূপ যে ঐশ্বরিক বিধি-নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো পুরোপুরি মানতে হবে এবং আন্তরিকভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আর যদি কদাচিৎ আল্লাহ ও নবীর

১. বাকারা : ২১৩
২. আনআম : ৯১

নির্দেশাবলি মানুষের কামনা-বাসনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয় সেক্ষেত্রে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে চলবে না। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশাবলির প্রতিই আত্মসমর্পিত থাকতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

'কোন বিশ্বাসী নর ও বিশ্বাসী নারীর এ অধিকার নেই যে, যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফয়সালা দান করেন তখন তারা তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে নিঃসন্দেহে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়েছে।'[১]

এ কারণেই কোরআন আত্মসমর্পণ ও আল্লাহর বান্দা হওয়াকে দ্বীনের মর্মকথা বলে মনে করে। আর আল্লাহ ভিন্ন বাকি সমস্তকেই বাতিল ঘোষণা করে। ইরশাদ হচ্ছে :

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ ۗ

'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট (একমাত্র) দ্বীন হচ্ছে ইসলাম (তথা সত্যের প্রতি আত্মসমর্পণ)।'[২]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾

'যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের অনুসন্ধান করে তবে তার থেকে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[৩]

উপসংহার

যদিও এ নিবন্ধে আধুনিকতাবাদী বিশ্বদৃষ্টি খুবই সংক্ষেপে কিছু সংজ্ঞার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে এবং একইভাবে ইসলামী বিশ্বদৃষ্টির বেলায়ও শুধু কয়েকটি মৌলনীতির

১. আহ্যাব : ৩৬
২. আলে ইমরান : ১৯
৩. আলে ইমরান : ৮৫

প্রতি ইশারা করেই ক্ষান্ত থাকা হয়েছে, তথাপি একটু মনোযোগের সাথে যদি উভয় বিশ্বদৃষ্টি সম্পর্কিত এখানে উপস্থাপিত আলোচনার প্রতি লক্ষ্য করা হয় তাহলে স্পষ্টতই দেখা যাবে যে, আধুনিক বিশ্বদৃষ্টির ভিত্তি ও কাঠামো ইসলামী বিশ্বদৃষ্টির ভিত্তি ও কাঠামোর সাথে প্রকাশ্য বৈরিতাপূর্ণ ও সাংঘর্ষিক। কেননা, একদিকে সেই অজড় ও অতিপ্রাকৃতিক অস্তিত্বসত্তা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং অনুরূপভাবে অদৃশ্যমান ফেরেশতাকুলের প্রতি বিশ্বাস আর অপরদিকে আধুনিক বিশ্বের জড়বাদী বিশ্বাস ও বস্তুজগতেই অস্তিত্বকে সীমাবদ্ধ বলে বিশ্বাস– এ দুয়ের মধ্যে কীভাবে সঙ্গতি সম্ভব? তদ্রূপ আধুনিক চিন্তাদর্শনে যেখানে জ্ঞানতত্ত্বকে শুধু ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করা হয়, তা সেই ধর্মীয় দাবির সাথে কীভাবে খাপ খাবে যার জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাষ্য হচ্ছে : মানুষের জন্য নবিগণের আনীত ঐশী প্রত্যাদেশলব্ধ শিক্ষা অত্যাবশ্যকীয়। আধুনিকতাবাদী বিশ্বদৃষ্টির দাবি হল মানুষই জগতের কেন্দ্রবিন্দু। আর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং নৈতিক মূল্যবোধসমূহ সবই তারই কামন-বাসনার অনুগামী। অপরদিকে ইসলামী বিশ্বদৃষ্টির দাবি হল মানুষের স্বীয় কামনা-বাসনাগুলোকে মূল্যবোধের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে মনে করা অনুচিত। বরং তার উচিত মহান আল্লাহর সমীপে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করা এবং কেবল তাঁরই বন্দেগি করা। এ দুই দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে শুধু বিস্তর ফারাকই বিদ্যমান নেই, এরা পরস্পর পরিপন্থীও বটে। তাছাড়া পশ্চিমা পণ্ডিতদের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি মোতাবেক আধুনিক বিশ্ব তখন থেকেই সূচনা হয়েছে যখন মানবজাতি নিজেকে ধর্মের অনুশাসন ও প্রভাব থেকে মুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছে। অর্থাৎ আধুনিকতাবাদী জগতের মূল ভিত্তি হচ্ছে সমুদয় অস্তিত্বজগতকে বস্তুজগতের সমান সমান মনে করা এবং ঈশ্বরকে নাকচ করা ও তাঁর সম্পর্কে সংশয় পোষণ। তাই এ দুয়ের পার্থক্য থেকে যে জিনিসটি অনায়াসে অনুমান করা যায় তা হল, ইসলামের আধুনিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন ও ইসলামকে আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে খাপ খাইয়ে চলার দাবি ধর্ম ও ইসলামের ভিত্তিকে (অর্থাৎ আল্লাহ, ওহি, ফেরেশতা এবং দ্বীনী ও আল্লাহর বন্দেগির শিক্ষাকে) পূর্ণরূপে নাকচ করারই নামান্তর। আজকের ভাষায় বলা যায় : 'মডার্ন ইসলাম' একটি অসমাধানযোগ্য Paradox আর ইসলামকে মডার্ন করার শত চেষ্টা কেবল অসম্ভব খেয়াল বৈ নয়। তবে সবশেষে বলে রাখা দরকার যে, আলোচনার এ সিদ্ধান্তের অর্থ এটা নয় যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভালো দিকগুলোকেও অস্বীকার করতে হবে। তদ্রূপ এটাও নয় যে, ইসলাম নতুন ও আধুনিক উদ্ভাবিত সবকিছুর সাথেই বৈরীভাবাপন্ন।

ওয়াহাবি মতবাদের স্বরূপ

মোহাম্মাদ রেজওয়ান হোসাইন

'ওয়াহাবি' মতবাদও অপরাপর বহু ফেরকার মতো একটি ফেরকা। ওয়াহাবি মতবাদের মূল ভাবনাগুলো গৃহীত হয়েছে ইবনে তাইমিয়ার চিন্তাধারা থেকে। তাই প্রথমেই ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিগুলো সংক্ষেপে পর্যালোচনা করে নেওয়া জরুরি। ৬৬১ হিজরিতে তাকিউদ্দিন আহমাদ ইবনে আব্দুল হালিম' তৎকালীন তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলীয় হাররান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইবনে তাইমিয়া নামেই বেশি পরিচিত। দামেস্কে যাবার পর 'দারুল হাদিস'-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন ইবনে তাইমিয়ার পিতা। সেখানে ইবনে তাইমিয়া পড়ালেখা করেন। তিনি তাঁর যৌবনকাল কাটান দামেস্কে। তাঁর পিতাসহ হাম্বলি মাজহাবের বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে তিনি ফিকাহ, হাদিস, উসুল, তাফসির, কালাম ইত্যাদি শেখেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং কোরআনের তাফসির পড়ানোর দায়িত্বে নিয়োজিত হন। ইবনে তাইমিয়া অন্যান্য ধর্ম এবং মাজহাব নিয়েও পড়ালেখা করেন এবং এমন কিছু ফতোয়া দিতে থাকেন যেগুলোর সাথে আহলে সুন্নাতের চার মাজহাবেরও কোনো মিল ছিল না।

ইবনে তাইমিয়া নিজেকে 'সালাফি' বলে মনে করতেন। সালাফি শব্দের পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে মূল নীতির অনুসরণ বা পূর্বপুরুষদের নিঃশর্ত অনুসরণ করা। তবে 'সালাফিয়া' একটি ফেরকার নাম যেই ফেরকায় নবীজী (সা.), তাঁর সাহাবিবর্গ এবং তাবেয়িদের (যাঁরা এক বা একাধিক সাহাবির সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন) অনুসরণের দাবি করা হয়। সালাফিরা মনে করতেন ইসলামের সকল আকিদা-বিশ্বাস সাহাবি এবং তাবেয়িদের আমল অনুযায়ী বাস্তবায়িত হওয়া উচিত। আর ইসলামী আকিদা কেবল কিতাব এবং সুন্নাত থেকেই গ্রহণ করতে হবে, আলেমদের উচিত হবে না কোরআনের বাহ্যিক অর্থের বাইরে কোনো দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে কোনো কিছু আমল বা বাস্তবায়ন করা। সালাফিদের চিন্তায় বিবেক-বুদ্ধি বা যুক্তি তথা গবেষণার

কোনো স্থান নেই, তাঁদের কাছে কেবল কোরআন-হাদিসের মূল টেক্সটের বাহ্যিক অর্থই প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

ইবনে তাইমিয়া যখন তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনাপ্রসূত বিভিন্ন মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেন, তখন তাঁর ওই সব বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। তিনি আল্লাহ সম্পর্কে বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ সশরীরী একটি সত্তা এবং তিনি আকাশসমূহের ঊর্ধ্বে থাকেন। ইবনে তাইমিয়াই প্রথম কোনো মুসলিম যিনি আল্লাহর সশরীরী সত্তার প্রবক্তা এবং এর পক্ষে লেখালেখিও করেছেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর রওজা শরিফ যিয়ারত করা কিংবা তাঁর সম্পর্কে কোনো স্মরণসভা বা কোনো অনুষ্ঠান করাকে হারাম এবং শির্ক বলে মনে করতেন। ইবনে তাইমিয়া নবীজীসহ সকল ওলি-আউলিয়ার কবর মেরামত করা বা পবিত্র কোনো কবরের পাশে মসজিদ নির্মাণ করারও বিরোধী ছিলেন এবং এ ধরনের কাজকে তিনি শির্ক বলে মনে করতেন।

তাঁর এইসব বক্তব্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মাজহাবের আলেমগণ তীব্র প্রতিবাদ জানান। মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত বিশ্বাসের সাথে ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য সাংঘর্ষিক হবার ফলে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। যার পরিণতিতে ৭০৫ হিজরিতে সিরিয়ার আদালত তাঁর বিরুদ্ধে মিশরে নির্বাসনের রায় দেয়। হিজরি ৭০৭ সালে তিনি কারামুক্ত হন এবং কয়েক বছর পর আবার সিরিয়ায় ফিরে আসেন এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূলে পুনরায় লেখালেখি করতে থাকেন। ৭২১ হিজরিতে আবারো তাঁকে কারাগারে আটক করা হয় এবং ৭২৮ হিজরির জিলকদ মাসের শেষের দিকে দামেস্কের কেল্লা কারাগারে মারা যান।

ইবনে তাইমিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর চিন্তাদর্শনেরও প্রায় মৃত্যু ঘটে গিয়েছিল। কিন্তু পাঁচ শতাব্দী পর মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদি নামের এক ব্যক্তি ইবনে তাইমিয়ার আকায়েদের ভিত্তিতে নতুন করে একটি ফেরকার জন্ম দেন। তাঁর ঐ ফেরকার নাম হচ্ছে 'ওয়াহাবিয়্যাত' বা ওয়াহাবি মতবাদ।

এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ১১১৫ হিজরিতে সৌদি আরবে জন্মগ্রহণ করেন। তরুণ বয়সে তিনি ইবনে তাইমিয়ার চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিলেন এবং পুনরায় সালাফি মতবাদের প্রচার ঘটান।

মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব মদিনাতেও ইসলামের নবীর শরণাপন্ন হওয়া বা তাঁর রওজা যিয়ারত করতে আসা মানুষের সমালোচনা করতেন। তিনি ধর্মের সরল সঠিক পথ থেকে এতো বেশি বিচ্যুত হন যে, আপামর মুসলমানকে কাফের-মুশরিক বলে ঘোষণা করতে শুরু করেন, এমনকি মুসলমানদের হত্যা করাকে ওয়াজিব বলেও মন্তব্য করেন। ধর্মীয় পবিত্র স্থাপনাগুলোকে দখল করা এবং ধ্বংস করাকে তাঁর অনুসারীদের ওপর ওয়াজিব বলে ঘোষণা করেন। সহিংসতা ছিল আব্দুল ওহাব এবং তাঁর অনুসারীদের আচরণগত প্রধান বৈশিষ্ট্য। মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাবের আকিদার বিষয়টি স্পষ্ট হবার পর তাঁর বিরুদ্ধে বহু সনামধন্য ও প্রসিদ্ধ আলেম রুখে দাঁড়ান। তাঁর নিজের ভাই শায়খ সোলায়মান– যিনি ছিলেন একজন হাম্বলি মাজহাবের আলেম, তিনিও ওয়াহাবের আকিদা প্রত্যাখ্যান করে একটি বই লেখেন। তারপরও আব্দুল ওয়াহাব তাঁর জাহেলি বিশ্বাসের ওপর স্থির থাকেন এবং যে কেউ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করলে তাকেই কাফের বলে সাব্যস্ত করেন।

এমনিতেই পশ্চিমা উপনিবেশবাদী শক্তিগুলো এ সময় চারদিক থেকে মুসলিম বিশ্বকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছিল। ব্রিটিশরা পূর্বদিক থেকে ভারতের বৃহৎ অংশ দখল করে পারস্য উপসাগর উপকূলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তারা প্রতিটি মুহূর্তে ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ফরাসিরাও নেপোলিয়নের নেতৃত্বে মিশর, সিরিয়া এবং ফিলিস্তিন দখল করে ভারতের দিকে যাবার চিন্তা করছিল। রুশরাও চেয়েছিল ইরান এবং তুরস্কে বারবার হামলা চালিয়ে তাদের সাম্রাজ্য একদিক থেকে ফিলিস্তিন পর্যন্ত অন্যদিকে সুদূর পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করতে। সে সময়ের আমেরিকাও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোর দিকে তাদের লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল। তারা লিবিয়া এবং আলজেরিয়ায় গুলিবর্ষণ করে মুসলিম বিশ্বে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা চালিয়েছিল। এমন একটি কঠিন পরিস্থিতিতে যখন শত্রুদের মোকাবিলায় মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতামূলক হৃদ্যতার প্রয়োজন ছিল, ঠিক সে সময় মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ভ্রান্ত মতাদর্শ প্রচারের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে কাফের সাব্যস্ত করে মুসলিম ঐক্যকে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন।

ওয়াহাবি মতবাদ প্রচারের একেবারে শুরুতেই যে কাজটি করা হয় তাহলো উয়াইনা'য় সাহাবিদের এবং অলি-আউলিয়ার মাযারগুলোকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। মোহাম্মদ

ইবনে আব্দুল ওয়াহাব আল্লাহর অলিদের শরণাপন্ন হওয়াকে শির্ক এবং মূর্তিপূজার মতো অপরাধ বলে গণ্য করতেন এবং যারা একাজ করত তাদেরকে কাফের বলতেন। তাদেরকে হত্যা করা জায়েয এবং তাদের মালামালকে যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমত বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই ফতোয়া পেয়ে তাঁর অনুসারীরা হাজার হাজার নিরীহ মুসলমানের রক্ত ঝরায়। মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব বিভিন্ন শহরের লোকজনকে তাঁর মতবাদের দিকে আমন্ত্রণ জানাতেন। যারা গ্রহণ করত তারা নিরাপদ ছিল আর যারা বিরোধিতা করত তাদের জান-মালকে হালাল ঘোষণা করে আক্রমণ চালাতেন। নজ্‌দ এবং নজ্‌দের বাইরে ওয়াহাবিরা এরকম বহু যুদ্ধ করেছে। ইয়েমেন, হেজাজ, সিরিয়ার উপকণ্ঠ, ইরাকে ওয়াহাবিরা যতো যুদ্ধ করেছে– সবই তাদের মতবাদ গ্রহণে অস্বীকৃতির কারণেই করেছে। ওয়াহাবের দৃষ্টিতে পবিত্র কোনো স্থাপনা, যেমন অলি-আউলিয়া, আহলে বাইতের ইমামদের মাযারের মতো মহান স্থাপনাগুলো যিয়ারত করা শির্ক, তাই এসব স্থাপনা যিয়ারতকারীদের জানমাল হরণ করা সওয়াবের কাজ। মক্কা দখল করার পর ওয়াহাবিরা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের নিদর্শনগুলো ধ্বংস করে দেয়। নবীজী (সা.)-এর জন্মস্থানের গম্বুজ, কাবায় হযরত আলী (আ.)-এর জন্মস্থানের গম্বুজ, হযরত খাদিজা (সা.), হযরত আবু বকরের স্মৃতিময় নিদর্শনগুলো ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। ওয়াহাবিরা এসব পবিত্র স্থাপনা ধ্বংস করার সময় তবলা বাজিয়ে গান গেয়ে নেচে নেচে উল্লাস করত। মুসলিম বিশ্বে ওয়াহাবিদের এই জঘন্য কর্মকা-ের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল।

ওসমানী সাম্রাজ্য সে সময় হেজাজ, ইয়েমেন, মিশর, ফিলিস্তিন, সিরিয়া এবং ইরাকের মতো মুসলিম ভূখ- জুড়ে বিস্তৃত ছিল। ওসমানী বাদশাহ মিশরের গভর্নরকে আদেশ দিয়েছিলেন ওয়াহাবিদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য। মিশরের গভর্নর মোহাম্মদ আলি পাশা ওসমানী সরকারের পক্ষ থেকে ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি সশস্ত্র যুদ্ধ করে ওয়াহাবিদেরকে পরাজিত করে মক্কা, মদিনা এবং তায়েফকে মুক্ত করতে সক্ষম হন। এভাবেই ১২১৩ হিজরিতে অর্থাৎ ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ওয়াহাবি মতবাদের প্রায় বিলুপ্তি ঘটে। এরপর অন্তত এক শতাব্দী সময়কাল পর্যন্ত ওয়াহাবি মতবাদের নামটিরও আর কোনো অস্তিত্ব ছিল না কিংবা বলা ভালো, এই ফেরকাটি নিয়ে আর কেউ কখনো কোনোরকম চিন্তাভাবনা করেনি।

আপামর জনগণ ওয়াহাবিপন্থীদের ভয়ে যেভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল সেই ভয় মানুষের মন থেকে ধীরে ধীরে কেটে যায়। কিন্তু ওসমানী সাম্রাজ্যের পতনের পর ব্রিটিশদের সহযোগিতায় ইতিহাসের বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আব্দুল আযিযের আগমনে সৌদ বংশের শক্তি যেমন ফিরে আসে, তেমনি বিচ্যুত ঐ ওয়াহাবি মতবাদের চর্চাও পুনরায় শুরু হয়।

সালাফিয়া আকিদায় বিশ্বাসীদের আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি হলো তাঁরা মনে করেন কেবলা হচ্ছে আল্লাহর সশরীরী উপস্থিতির স্থান। নামায পড়ার সময় এভাবেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সকল মুসল্লির সামনে উপস্থিত থাকেন বলে তাঁদের বিশ্বাস। বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ইবনে হাজার মাক্কি তাঁর 'আলফাতাভি-আল-হাদিসা' নামক গ্রন্থে ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে লিখেছেন যে, খোদা তাঁকে অন্ধ, বধির, গোমরাহ, হীন এবং অপদস্থ করে দিয়েছেন। তাঁর সমকালীন আহলে সুন্নাতের ফকিহ ইমামগণ, যেমন ইমাম শাফেয়ী (রহ.), ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অনুসারী ফকিহগণ তাইমিয়ার চিন্তা-চেতনা এবং কথাবার্তা সম্পর্কে বলেছেন, 'ইবনে তাইমিয়ার কথাবার্তা মূল্যহীন এবং তিনি বেদায়াত সৃষ্টিকারী, গোমরাহ ও ভারসাম্যহীন।'

ইবনে তাইমিয়া আরো বিশ্বাস করেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে আমাদের বাহ্যিক চোখ দিয়ে দেখা সম্ভব। ওয়াহাবিরা আল্লাহকে দেখার বিষয়টি নিয়ে এতো বেশি বাড়াবাড়ি করেছে, এতো বেশি সীমা লঙ্ঘন করেছে যে, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন যে কোনো সচেতন চিন্তার মানুষই তাদের ওই চরমপন্থী কথাবার্তায় বিস্মিত না হয়ে পারে না। ইবনে তাইমিয়া বিশ্বাস করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহপাক তাঁর নিজ চেহারায় মানুষের সামনে আসবেন এবং আত্মপরিচয় দিয়ে বলবেন, 'আমি তোমাদের আল্লাহ'।

ইবনে তাইমিয়ার চিন্তাধারার অন্যতম প্রচারক মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব বলেছিলেন, 'যারা ফেরেশতা, পয়গাম্বর এবং আল্লাহর অলিদেরকে নিজেদের শাফায়াতকারী হিসেবে চিন্তা করে কিংবা তাঁদের উসিলায় আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশা করে, তাদেরকে হত্যা করা বৈধ এবং তাদের মালামাল মোবাহ।'

মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব তাঁর এই মনগড়া চিন্তাধারার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন এবং কোনো রকম প্রমাণ ছাড়াই নিজের বিচ্যুত চিন্তাধারাকে

ইসলামের ধর্মীয় চিন্তা বলে উল্লেখ করেছেন। শিয়াদের ব্যাপারে ওয়াহাবিরা কুফ্‌রির অভিযোগ এনে তাদের রক্তকে হালাল বলে ঘোষণা করলেও বাস্তবতা হলো এই যে, আল্লাহর একত্ব, নবী করিম (সা.)-এর রেসালাত, কোরআনের প্রতি ঈমান, পরকালের প্রতি ঈমান ইত্যাদির মতো বিষয়গুলোর ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস এবং শিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি এক ও অভিন্ন।

ইসলামে যিয়ারতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যিয়ারত মুসলমানদের ইবাদতের কর্মসূচিগুলোর একটি। মুসলমানরা শাফায়াতের প্রতি বিশ্বাস অনুযায়ী তাওয়াসসুল এবং পুত-পবিত্র ব্যক্তিত্ববর্গের কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে তর্কাতীত বিষয় বলে মনে করে। কিন্তু সালাফিয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ইবনে তাইমিয়া নবীজী (সা.)-এর কবর যিয়ারত করাকে, এমনকি যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করাকেও হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বুযুর্গানে দ্বীনের কবর যিয়ারত করাকে 'কবর পূজা' বলে অভিহিত করে এটাকে জাহেলিয়াতের যুগের মূর্তিপূজার সাথে তুলনা করেছেন। দ্বাদশ শতাব্দীতেও মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব আলে সৌদের সহযোগিতায় ইবনে তাইমিয়ার আকিদার বিস্তার ঘটান, যিয়ারতকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং হারাম শরিফের নিকটবর্তী কবরসমূহ ও অন্যান্য পবিত্র স্থাপনা ধ্বংস করে ফেলেন। অথচ যিয়ারত সম্পর্কে স্বয়ং নবী করিম (সা.)-এর একটি হাদিস হলো, 'বেশি বেশি কবর যিয়ারত করবে যাতে পরকালীন পৃথিবীর কথা মনে জাগে।' আরেকটি হাদিস এরকম, 'কবর যিয়ারতে যাবে, কেননা, তার মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা।' এ হাদিসের আলোকে ইবনে তাইমিয়ার এ ধরনের কথাবার্তা কেবল যে ভিত্তিহীন এবং বাতিল তাই নয়, বরং বেয়াদবিপূর্ণও বটে।

মুসলমানরা সবসময়ই দ্বীনের মহান মনীষীদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাঁদেরকে স্মরণ করে এসেছে। এমনকি তাঁদের সমাধিসৌধ নির্মাণ করে মাযারের পাশে মসজিদ তৈরি করে ইবাদত বন্দেগির মধ্য দিয়ে মনীষীদের স্মৃতিকে মনের ভেতরে জাগ্রত রেখে এসেছে। কিন্তু ওয়াহাবিরা আল্লাহর অলি, সালেহিন, এমনকি নবীদের কবরের ওপরেও মসজিদ কিংবা সমাধিসৌধ নির্মাণ করাকে 'বেদাআত' বলে অভিহিত করেছে। ১৯২৬ সালে মদিনায় বাকি কবরস্থানে নবী করিম (সা.)-এর সাহাবিবৃন্দ এবং তাঁর পরিবারের সদস্যগণের মাযারগুলোকে ধ্বংস করার ঘটনা ওয়াহাবিদের সবচেয়ে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও ধৃষ্টতামূলক আচরণ হিসেবে পরিগণিত। অথচ আজ পর্যন্তও

সালাফি বা ওয়াহাবি আলেমরা তাঁদের এই অমানবিক, নোংরা ও ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজের পক্ষে দ্বীনি প্রমাণ তো দূরের কথা, বুদ্ধিবৃত্তিক কোনো যুক্তিও দেখাতে পারেনি।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, শিয়া মাযহাবের অনুসারীরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সন্তান এবং তাঁর পরিবারের সদস্যগণের কবরের ওপর স্থাপনা বা সৌধ নির্মাণ করেছেন। সুন্নি মাযহাবের অনুসারীরাও শহীদ ব্যক্তিবর্গ এবং বুযুর্গানে দ্বীনের কবরের ওপর গম্বুজ ও স্থাপনা নির্মাণ করেছেন এবং তাঁদের কবর যিয়ারত করেন। সব মুসলমানই নবী-রাসূলসহ আল্লাহর অলিদের কবর যিয়ারত করাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি উপায় বলে মনে করেন। সে লক্ষ্যে এগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করাটাও ইসলামী মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের অংশ বলে মনে করেন। কেবল ওয়াহাবি মতবাদের অনুসারীরাই এর বিরুদ্ধে গিয়ে পবিত্র স্থাপনাগুলোকে ধ্বংস করে ফেলায় বিশ্বাস করে। ওয়াহাবি মতবাদের আবির্ভাবের আগে ইসলামের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো সংরক্ষিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনী লিখিত আকারে সংরক্ষণ করা ছাড়াও তাঁর ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত জিনিসপত্র, যেমন আংটি, জুতা, মেসওয়াক, তলোয়ার, ঢাল, এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা.) যেসব কূপ থেকে পানি খেয়েছেন সেই কূপগুলো পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে ওয়াহাবিদের ধ্বংসযজ্ঞের কারণে সেগুলোর খুব কমই এখন অবশিষ্ট রয়েছে।

ইবনে তাইমিয়ার সমকালীন বিখ্যাত আলেম তাকি উদ্দিন সুবকি (মৃত্যু ৭৫৬ হিজরি) ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে লিখেছেন : 'ইবনে তাইমিয়া কোরআন এবং সুন্নাহর অনুসরণের আড়ালে ইসলামী আকিদায় বেদআত ঢুকিয়ে ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলোকে এলোমেলো করে দিয়েছেন। তিনি মুসলমানদের সামগ্রিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন।' আলেমসমাজ ইবনে তাইমিয়ার লেখা বইগুলো পর্যালোচনা করে বলেছেন, আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর সত্তাসহ ইসলামের অন্যান্য বিধান সম্পর্কে তাঁর যে বক্তব্য সেগুলো একান্তই শিশুসুলভ। তাঁর সেইসব বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়, ইসলামের গভীর এবং মূল্যবান তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই নেই। নতুন নতুন আবিষ্কার যদি ইসলামের জন্য ক্ষতির কারণ না হয় সেগুলোকে ইসলাম স্বাগত জানায়। অথচ ওয়াহাবিরা তাদের বিকৃত এবং ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোকে বেদআত বলে মনে করে। তারা বলে, এগুলো মানুষকে আল্লাহ

থেকে বিমুখ করে তোলে, তাই এগুলো ব্যবহার করা শির্ক। সৌদি আরবে মহিলাদের গাড়ি চালানোর ওপর নিষেধাজ্ঞাসহ এ ধরনের আরো অনেক প্রতিবন্ধকতার কারণে আধুনিক টেকনোলজির কল্যাণ থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। কিছুদিন আগেও সৌদি আরবে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা শির্ক হিসেবে গণ্য ছিল। এখনো ওয়াহাবি আলেমদের দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক অনেক প্রযুক্তির ব্যবহার হারাম। ওয়াহাবিরা নিজেদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অন্যান্য মুসলমানকে মুশরিক বলে ঘোষণা করে এবং তাদের জান-মাল, এমনকি নারীদেরকে নিজেদের জন্য হালাল বলে ঘোষণা করে। উগ্র এই মতবাদের সহিংসতার অসন্তোষজনক পরিণতি এখন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বিকৃত চিন্তাধারার অধিকারী ওয়াহাবি মতবাদের ধারক হচ্ছে এযুগের সহিংসতাকামী গোষ্ঠী তালেবান, আল-কায়েদা এবং এ জাতীয় আরো অনেক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী। আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং ইরাকসহ আরো অনেক দেশে পাশবিক হামলা চালিয়ে এরা বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামকে ভয়ঙ্কর চেহারায় তুলে ধরছে। ভয়াবহ এই সালাফি গোষ্ঠীগুলো অন্যান্য মুসলমানকে মুশরিক ভেবে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করছে। এবারে উগ্র এই গোষ্ঠীগুলোর পেছনের ইতিহাসের দিকে নজর দেয়া যাক।

আফগানিস্তানের সন্ত্রাসী এবং ওয়াহাবি গোষ্ঠী 'তালেবান' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, পাকিস্তান ও সৌদি আরবের যৌথ প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হয়েছে। তাদের নেতা হলো মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর। এই গোষ্ঠীটি ১৯৯৬ সালে ব্যাপক হত্যাকা- চালিয়ে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল দখল করে এবং দেশের শাসনভার হাতে তুলে নেয়। তারা ওয়াহাবিদের কাঙ্ক্ষিত সরকারের নমুনা জনগণের সামনে তুলে ধরে। তারা ইসলামের নামে নৃশংস এবং মূর্খতাপূর্ণ আইন-কানুন চালু করে। সিনেমা থিয়েটার বন্ধ করে দেয়। জনগণকে বেত্রাঘাত করে জামায়াতে নামায পড়তে বাধ্য করে এবং লম্বা দাড়ি রাখতেও বাধ্য করে। তালেবানরা মেয়েদের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং মহিলাদেরকে ঘরের বাইরে কাজ করতে নিষেধ করে। তালেবানরা তাদের আকিদাবিরোধীদের হত্যা করে– সে সুন্নি হোক কিংবা শিয়া। এই উগ্র গোষ্ঠীটি মুসলমানদের ঐক্যকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং পশ্চিমা মিডিয়াগুলোকে ইসলামবিরোধী প্রচারণা চালাবার মোক্ষম সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এরকম আরো গোষ্ঠী আছে পাকিস্তানে। তালেবান এবং সৌদি আরবের সহযোগিতায়

সৃষ্টি হয়েছে এই গোষ্ঠীটি। এরা ওয়াহাবিদের চেয়েও বেশি উগ্র। নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে পাকিস্তানের শিয়া মুসলমানদেরকে তারা নির্দয়ভাবে হত্যা করছে। মসজিদে নামাযরত অবস্থায়ও এই উগ্র গোষ্ঠীটি মুসল্লিদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

আল-কায়েদা এরকম আরেকটি গোষ্ঠী। ওসামা বিন লাদেনের মাধ্যমে এই গোষ্ঠীটির জন্ম হয়। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এই গোষ্ঠীটির গোপন সম্পর্ক রয়েছে তবুও ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলার পেছনে এই গোষ্ঠীটির হাত থাকার অজুহাতে আল-কায়েদার ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত আফগানিস্তানের ওপর মার্কিনীরা হামলা চালিয়ে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মুসলমানকে হত্যা করে। ওয়াহাবি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীটি এখন বিভিন্ন দল ও সংগঠনের নামে ইরাক, ইরান, ইয়েমেন, সিরিয়া, সোমালিয়াসহ আরো বহু মুসলিম দেশে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তারা মুসলমানদেরকেই তাদের প্রধান শত্রু বলে মনে করছে।

এরাই ইসলামের নামে বিভিন্ন দেশে হাটে-বাজারে, লোকালয়ে বা জনসমাগম স্থলে, মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ হত্যা করছে, নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করছে, সিরিয়ায় সরকারি সেনাদের হত্যা করে তাদের কলিজা চিবিয়ে খেয়েছে।

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, রাসূলের প্রতি ভালোবাসা, সালেহীন এবং সকল মানুষকে ভালোবাসা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। ভালোবাসা এবং প্রেমের ভিত্তিমূলে সৃষ্ট এই ঐশী ধর্ম এখন ওয়াহাবিদের মতো উগ্র গোষ্ঠীগুলোর কার্যক্রমের ফলে সুযোগসন্ধানী ইসলামের শত্রুরা এই ধর্মকে বিকৃতভাবে তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছে। ওয়াহাবিদের কার্যক্রমকে কাজে লাগিয়ে তারা ইসলাম এবং সব মুসলমানকে উগ্র এবং সন্ত্রাসী বলে প্রচার চালাচ্ছে। ওয়াহাবি মতবাদ সৌদি আরবে এমনভাবে শেকড় গেড়েছে যে তাদের সংস্কৃতি, তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বিচার বিভাগ পর্যন্ত ওয়াহাবি মতাদর্শের আলোকে গঠিত হয়েছে। ক্ষমতার উচ্চ আসনগুলো ওয়াহাবি মুফতিগণের হাতে চলে গেছে এবং আলে-সৌদ সরকারের নীতি নির্ধারণী ব্যবস্থায় তারা উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। দেশের আইন ও বিচার মন্ত্রী, হজ মন্ত্রী, ইসলামী মর্যাদা বিষয়ক মন্ত্রী, আওকাফ এবং ইসলামী দাওয়াত সংস্থার মহাসচিবসহ গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো ওয়াহাবি মুফতিদের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়োগ দেওয়া হয়। ওয়াহাবিরা পবিত্র কাবা ও

মদীনা শরিফাইনের ওপর কর্তৃত্ব ছাড়াও বড় বড় অনেক সংস্থা গঠন করেছে। এই সংস্থাগুলোর মাধ্যমে তারা ওয়াহাবিদের বিকৃত মতবাদের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়ে থাকে।

মধ্যপ্রাচ্যের কতিপয় সরকার এখন তাদের সকল অর্থ সম্পদ ব্যয় করে ওয়াহাবি ফেরকা বিস্তারের মূল ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তারা তাদের দেশে এই মতবাদ ছাড়া অন্য কোনো মাযহাবের কার্যক্রমকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তারা ওয়াহাবিদের ছাড়া অন্যদেরকে মুসলমানই মনে করে না, কাফের, মুশরিক এবং বেদআতি বলে ভাবে।

দুঃখজনকভাবে মুহাম্মাদি খাঁটি ইসলাম যেখান থেকে সূচিত হয়েছে সেই সৌদি আরবের লোকেরাই এ ব্যাপারে উদাসীন। ইসলামের ঐশী বিধিবিধানগুলো ওহি নাযিলের স্থানেই ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। ভালোবাসা সেখানে সহিংসতায় পরিণত হচ্ছে, ইসলামী ঐক্য পরিণত হচ্ছে বিভেদে আর স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তা সেখানে রূপ নিচ্ছে গোঁড়ামিতে। আলে সৌদ সরকার ওয়াহাবি মতবাদের বিকৃত ও ভ্রান্ত শিক্ষাদর্শের ভিত্তিতে মুসলমানদের মাঝে রহমতপূর্ণ, দয়াপূর্ণ, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ এক স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার পরিবর্তে ইসলামবিরোধী বলদর্পী শক্তিগুলোর হাতে হাত মিলিয়ে তাদের নীতিই ওয়াহাবি মতবাদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, আলে সৌদ সরকার এবং সৌদি আরবের ওয়াহাবি মতবাদ হচ্ছে মুসলিম বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো আধিপত্যবাদী সরকারগুলোর শক্তিশালী নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল। বাস্তবতা হলো এই যে, ওয়াহাবি মতবাদের শিক্ষাগুলো উপনিবেশবাদীদের লক্ষ্যগুলোই বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে আর হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর খাঁটি ইসলামকে নির্মূল করতে সহায়তা করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার প্রফেসর হামিদ আলগার 'ওয়াহাবিজম' নামে গবেষণামূলক একটি গ্রন্থে লিখেছেন : সৌদি আরবের মতো দেশে এবং মুসলিম বিশ্বের ভৌগোলিক মূল কেন্দ্র হারামাইনের কাছে এই মতবাদটির উত্থান ঘটার পাশাপাশি তেলের বিশাল সম্পদের অধিকারী সৌদি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই মতবাদটি টিকে আছে। এ দুটি সুবিধা না থাকলে ওয়াহাবি মতবাদটি ইতিহাসে তার গুরুত্ব হারাতো।'

আরব দেশগুলো ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও যেখানেই ওয়াহাবিরা উপযুক্ত মনে করেছে সেখানেই প্রচুর টাকা-পয়সা খরচ করে তাদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারের চেষ্টা করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে ওয়াহাবি মতবাদের অনুসারী ধর্মীয় নেতারা মধ্যপ্রাচ্যের কতিপয় দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রচারণাগত সুযোগ-সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তারা পাকিস্তানসহ অনেক দেশের অসংখ্য যুবককে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার জন্য উৎসাহিত করে। বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপ গঠন করা, আর্থিক এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া থেকেও তারা পিছিয়ে নেই। আফগানিস্তানের অভ্যন্তরেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের সামরিক ও আর্থিক সহযোগিতায় তালেবান নামের দলটি গড়ে তোলে। সৌদি সরকার তালেবানদেরকে সামরিক ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে তাদের মাধ্যমে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে ব্যাপক হস্তক্ষেপ চালায়। মিশরেও তারা সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে ওয়াহাবি মতবাদে আকৃষ্ট করার চেষ্টা চালায়। বাংলাদেশেও বিভিন্ন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর ওপর ভর করে তারা তৎপরতা চালাচ্ছে।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মুসলমানরা ওয়াহাবিদের নীতি আদর্শে প্রভাবিত। ককেশাস এবং মধ্য-এশিয়ার নেতৃবৃন্দ তাদের এলাকায় ওয়াহাবিদের অবস্থান শক্তিশালী করার প্রচেষ্টার ব্যাপারে বহুবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতির কারণেই এই অঞ্চলের দেশগুলোতে বিশেষ করে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ওয়াহাবি মতবাদ বিকাশ লাভ করতে পেরেছে। ভারতও একই বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে। সেখানে বহু ধর্ম ও মাযহাব রয়েছে। জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী দেশ ভারত থেকে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করার পর সে দেশটিও ওয়াহাবি মতবাদ প্রচার থেকে মুক্ত ছিল না। কারণ, ভারতের মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা নাজুক থাকায় সৌদি ওয়াহাবিরা তাদেরকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি ওয়াহাবি মতবাদও প্রচার করে।

ওয়াহাবি ফেরকা গড়ে ওঠার শুরুর দিকে তাদের অজ্ঞতা আর গোঁড়ামির কারণে নতুন নতুন সকল আবিষ্কারকে বেদআত ও হারাম ঘোষণা করা হয়েছিল। রাসূলের যুগের পদ্ধতিতে জীবনযাপন করতে হবে– এই অজুহাত দেখিয়ে তারা মানব

সভ্যতার নতুন নতুন সকল উদ্ভাবনীর বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগে গিয়েছিল। সালাফিরা অবশ্য এখন তাদের ফতোয়া বা কর্মপদ্ধতিতে অনেক পরিবর্তন এনেছে। এই পরিবর্তনের মানে হলো তারা ইবনে তাইমিয়া এবং মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের বহু আকিদা-বিশ্বাস থেকে সরে এসেছে। ওয়াহাবি আলেমরা দেখলেন যে, মানব সভ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় এসব প্রযুক্তির বিরুদ্ধে মূর্খের মতো ফতোয়া জারি করলে বর্তমান বিশ্বে তাঁদের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যাবে, যার ফলে ইতিহাসের আস্তা-কুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবেন শীঘ্রই। এ কারণেই তুলনামূলকভাবে কম কুসংস্কারাচ্ছন্ন ওয়াহাবি মুফতিরা তাঁদের ফতোয়ায় পরিবর্তন এনেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মোবাইল, সাইকেল, গাড়ি, টেলিভিশন, ক্যামেরা ইত্যাদির ব্যবহারকে এক সময় ওয়াহাবি আলেমরা হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন এগুলোর ব্যবহার হালাল বলে গণ্য করা হচ্ছে। আগের মতো এখন আর এসব প্রযুক্তির ব্যবহারকে শির্ক বলে মনে করা হচ্ছে না। এ থেকেই তাঁদের আকিদা অর্থাৎ ওয়াহাবি মতবাদ এবং তার বাস্তব প্রয়োগের মাঝে ব্যাপক বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। আর এই বৈপরীত্য থেকেই বোঝা যায়, ওয়াহাবি মতবাদ একটি ভ্রান্ত মতবাদ এবং এই মতবাদ এখন পতনোন্মুখ।

ওয়াহাবিরা কথায় কথায় সব কিছুকে বেদআত বলে প্রচার চালায়। তাদের কিছু প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাসের উদাহরণ দেয়া যাক– যা সুন্নি সমাজে বেশ প্রভাব ফেলেছে। যেমন, প্রচলিত নিয়মে সূর করে মিলাদ পড়া, মিলাদে দাঁড়ানো বেদআত। শবে বরাত, শবে মেরাজ, বিশ্বনবী (সা.)-এর জন্মদিন বা ঈদে মিলাদুন্নবি পালন, পীর-মুরিদ ও বাইয়াত পদ্ধতি বেদআত। চল্লিশা, মৃত্যু দিবস, কুলখানি, মৃতের জন্য কুরআন খতম, দোয়া ইউনুস খতম, মানুষ মারা গেলে কান্নাকাটি করা বেদআত ইত্যাদি। সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি বিন বাজ ফতোয়া দিয়েছেন, রাসূলের মাজারে কান্নাকাটি করা যাবে না, মেয়েদের কণ্ঠস্বর বাইরের কোনো পুরুষ যেন শুনতে না পায়, যদি অফিসে নারী-পুরুষকে একসঙ্গে কাজ করতে হয় তাহলে তাদেরকে অবশ্যই একই নারীর দুধ খাওয়া দুধ ভাই-বোন হতে হবে, অন্যথায় এক অফিস বা প্রতিষ্ঠানে কাজ করা হারাম, হযরত আলী ও ইমাম হুসাইনের মাজারসহ বিশ্বের সব ওলি-আউলিয়ার মাজার ভেঙ্গে ফেলা উচিত, এমনকি রাসূলের মাজারও রাখা ঠিক নয়, আহলে কিতাবের অনুসারী হওয়ার কারণেই ইহুদি খ্রিস্টানরা ভালো এবং শিয়ারা খারাপ, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে বলে বিশ্বাস করলে সে কাফের

হয়ে যাবে। এ ছাড়া, ছবি তোলা, টিভি দেখা হারাম, মেয়েদের স্কুল-কলেজে যাওয়া পাপ ... ইত্যাদি।

সৌদি আরবের মুফতি নাসের আল ওমর শিয়াদের বিরুদ্ধে তার ফতোয়ায় বলেছেন, "শিয়ারা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের চেয়েও বিপদজনক। তাই জিহাদি চেতনায় উজ্জীবিত একটি ইসলামি সরকার ব্যবস্থায় তাদেরকে পুরোপুরি নির্মূল করতে হবে। হয় শিয়াদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে নয়তো মৃত্যুবরণ করতে হবে। আর শিয়া নারীদেরকে সমতার ভিত্তিতে মুজাহিদদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। তাদের শিশুদেরকে সুন্নিদের ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষা দিতে হবে এবং তাদের শেরেকি গ্রন্থগুলো ধ্বংস করে ফেলতে হবে। শিয়া শিশুদেরকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেয়া উচিত যাতে তারা এক জায়গায় অবস্থান করতে না পারে। শিয়া শিশুদের নাম রাখা উচিত আবু বকর, ওমর, মুয়াবিয়া, এজিদ, আয়েশা প্রভৃতি। এ ছাড়া, ১০ই মহরম বা আশুরার দিন উৎসব পালন করা এবং শিয়াদেরকে এ উৎসবে যোগ দিতে বাধ্য করা উচিত।" সৌদি আরবের এই মুফতি সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদ সরকার বিরোধী বিদেশি মদদ-পুষ্ট সন্ত্রাসী বিদ্রোহীদের মনোরঞ্জনের জন্য ও তাদের জিহাদি চেতনা ধরে রাখার জন্য মুসলিম নারীদের 'যৌন জিহাদে' অংশ নেয়ার জন্য সিরিয়ায় যাওয়ার ফতোয়া জারি করেছেন।

ডক্টর এসাম আল এমাদ ইয়েমেনের একজন নামকরা ওয়াহাবি মুফতি ছিলেন। তিনি প্রচুর পড়ালেখা করার পর বুঝতে পারলেন যে, ওয়াহাবি মতবাদ ভ্রান্ত একটি মতবাদ। সে কারণে ঐ মতবাদ ছেড়ে দিয়ে তিনি আহলে বাইতের ভক্ত হয়ে যান। তিনি বলেছেন, 'আমি সৌদি আরবের সাবেক মুফতি 'বিন বাযে'র কাছে লেখাপড়া করতাম। তবে সব সময় ভাবতাম যে, শতাব্দির পর শতাব্দি পেরিয়ে যাবার পরও এখনো কেনো মানুষের মনে ইমাম আলী (আ.) কিংবা ইমাম হোসেন (আ.) এবং অন্যান্য মহান ইমামদের চিন্তাদর্শ জাগ্রত রয়েছে, কেনো এগুলো পুরনো হয়ে যাচ্ছে না। অন্যদিকে সৌদিআরবের শিক্ষামূলক সভা বা অধিবেশনগুলোতে ইমাম আলী (আ.) এবং ইমাম হোসেন (আ.)-এর ব্যাপক সমালোচনা হতো। আবার আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করতাম ইয়াজিদ ও তার পিতা মুয়াবিয়ার অত্যাচারগুলোর পক্ষে ব্যাখ্যা দেওয়া হতো। একবার এক সভায় দেখলাম অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে আলী (আ.)-এর সমালোচনা করা হচ্ছে আর তাঁর ব্যাপারে নোংরা শব্দ ও কথা ব্যবহার করা হচ্ছে।

বিষয়টা আমাকে একটু ভাবিয়ে তুললো। বাধ্য হয়ে আহলে বাইতের সদস্যদের নিয়ে পড়ালেখা শুরু করে দিলাম। পড়ালেখার একটা পর্যায়ে বুঝতে পারলাম ইমাম আলী(আ.)-এর সকল কথাই ছিল যৌক্তিক এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ। তখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে ওয়াহাবিদের সকল ব্যাখ্যাই বা বক্তব্যই যুক্তি বহির্ভূত এবং অশালীন।"

ওয়াহাবি থেকে শিয়া মাজহাব গ্রহণকারী ইয়েমেনের এই মুফতি এসাম আলি ইয়াহিয়া আল-এমাদ বলেন, ওয়াহাবিদের সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যাটি হলো সহিংসতা ও হত্যাকা-। তাঁর মতেওঅধিকাংশ ওয়াহাবিই মূর্খতার কারণে বিপথগামী। তারা কোরআনের বক্তব্যকে ভুলভাবে গ্রহণ করেছে। এটাই তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা।

মজার ব্যাপার হলো মার্কসিজম, বাহায়ি, ইসরাইলি ও মার্কিনীদের মতাদর্শের বিরুদ্ধে ওয়াহাবি মুফতি বা আলেমদের লেখা কোনো বই নেই, তাদের যতো লেখা সব মুসলমানদের বিরুদ্ধে। এমনকি সৌদি আরবের মতো দেশটির নীতি হলো মার্কিন ও ইসরাইলিদের স্বার্থ রক্ষা করা। ওয়াহাবিদের ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসের চাইতে আরো বিপদজনক বিষয় হচ্ছে, এদের যাবতীয় কার্যক্রম লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বায়তুল মোকাদ্দাস দখলদার ইসরাইল ও মার্কিন নেতৃত্বে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষে তারা কাজ করছে। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল বিরোধী ইরান, সিরিয়া, হিজবুল্লাহ ও হামাসের মত প্রতিরোধ শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে ওয়াহাবিরা। বাস্তবতা হচ্ছে, ইসরাইল ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোই ইসলামের নামে আল-কায়দা, তালেবান নামে বিভিন্ন উগ্র গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছে যাদের লক্ষ্য, ইসলামের নামে ভ্রান্ত বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। এ ছাড়া, ইউরোপ ও আমেরিকায় মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। ইসলাম ও মুসলমানদের প্রভাব বিস্তারে পাশ্চাত্যের সরকারগুলো চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় তারা আল-কায়দা ও তালেবানের মত উগ্র গোষ্ঠীগুলোর হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমকে ইসলামপন্থীদের কাজ বলে প্রচার চালাচ্ছে যার উদ্দেশ্য ইসলামের সৌন্দর্য ও শান্তিকামী চেহারাকে ধ্বংস করা এবং মানুষকে প্রকৃত ইসলাম বুঝতে না দেয়া।

পাশ্চাত্যে ইসলাম ও মুসলমানের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ঠেকানোই এর উদ্দেশ্য। এ ছাড়া, ইরান ও হিজবুল্লাহর মত শিয়া গোষ্ঠী ইসরাইল ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়ার কারণেও ওয়াহাবিরা শিয়াদের বিরুদ্ধে অবস্থান

নিয়েছে। যাইহোক, আমি আমার স্বল্প জ্ঞানে ইসলামের অত্যন্ত জটিল একটি বিষয়কে সহজ ও সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আসলে শিয়া, সুন্নি, ওয়াহাবি নির্বিশেষে আমরা সবাই মুসলমান এবং আমাদের শত্রু অভিন্ন। সেই শত্রুকে চিহ্নিত করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করাই বাঞ্ছনীয়। নীচে যে সম্পর্কে আলোচনা করব তা বোঝানোর জন্যই মূলত উপরের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হয়েছে। এবার মূল কথায় আসা যাক।

(ক) ইসলামি বিপ্লব ও ধর্মভিত্তিক জনগণের শাসন ব্যবস্থা

মুমিন মুসলমানদের মূল লক্ষ্য হল সকল মতবাদের বিপরীতে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা অর্থাৎ ইসলামি বিপ্লব বা সমাজ নির্মাণ। ইসলামি বিপ্লবের জন্য সংগ্রাম এমন এক বাস্তবতা যেখানে বাতিলের সাথে, অলসতার সাথে কিংবা দুনিয়া পূজার সাথে কোনো প্রকার আপোষ চলে না। ইসলামি বিপ্লব হচ্ছে মানুষের প্রতিষ্ঠিত সব মতবাদ বা সরকার ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে আল্লাহর মনোনীত শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা। এ বিপ্লব মানেই আমূল পরিবর্তন। এ পরিবর্তন হতে হবে চিন্তা জগতে, দেশ পরিচালনায়, রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, বিচার ব্যবস্থায়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায়, সাংস্কৃতিক অঙ্গনে, প্রচার মাধ্যমে, প্রতিরক্ষা শক্তিতে, শিক্ষা ব্যবস্থায় .... ইত্যাদি।

এ ছাড়া, আলেম সমাজ ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পি-তদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার বিপ্লবকে চূড়ান্ত রূপ দেয়ার অন্যতম শর্ত। বিশেষ করে আদর্শিক ক্ষেত্রে জনগণের মাঝে বিরাট কোনো ব্যবধান থাকা চলবে না। এ এমন এক ইসলামি বিপ্লবী সমাজ ব্যবস্থা যেখানে শয়তানি শক্তির অনুপ্রবেশের কোনো সুযোগই থাকবে না। আর তাহলেই কেবল ইসলামি বিপ্লব চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে এবং এ ধরণের ইসলামি বিপ্লবী সরকারের পক্ষেই কেবল গণমানুষের কল্যাণে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সম্ভব। বর্তমান বিশ্বে এ বিপ্লবের একটি মাত্র উদাহরণ হচ্ছে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান যে দেশটি শত বাধা বিপত্তি ও ষড়যন্ত্র ডিঙ্গিয়ে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে টিকে আছে। ইরানে ধর্মভিত্তিক জনগণের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। বিপ্লবী আদর্শের প্রতি সম্মান রেখে রাজনীতি করা ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার ইরানে আছে। প্রচলিত গণতান্ত্রিক বিশ্বে যে কেউ প্রেসিডেন্ট বা দেশের শীর্ষ কোনো

পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। কিন্তু ইরানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়াতে হলে তার কিছু যোগ্যতা থাকতে হয়। প্রথমেই তাকে মুসলমান হতে হবে, ইসলামি

বিপ্লব ও সরকারে তার অবদান থাকতে হবে, দেশ ও জাতির খেদমতে অতীত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি বা অপরাধী কর্মকা- বিষয়ে কোনো মামলা থাকতে পারবে না এবং সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার প্রতি অনুগত থাকতে হবে। তবেই একজন ব্যক্তি ইরানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন। ফলে যিনিই নির্বাচিত হন না কেনো জনগণের হতাশ হওয়ার কিছুই নেই।

অন্যান্য মুসলিম দেশে প্রচলিত বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে সরে এসে ইরানে যে ধর্মভিত্তিক জনগণের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সুফল অশেষ। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভিন্নমত বা ভিন্ন আদর্শের রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার নামে অনৈসলামিক কোনো দল বা সংগঠন গড়ে ওঠার সুযোগ নেই। যদি এ ধরণের কোনো গ্রুপ গড়ে উঠতো বা সুযোগ দেয়া হত তাহলে ইসলামের শত্রুরা ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো এসব জনসমর্থনহীন অতি ক্ষুদ্র গ্রুপকে হাতিয়ার করে এবং তাদেরকে প্রচুর অর্থ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বিপ্লব, ইসলামি সরকার ও জনকল্যাণমূলক সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংসের চেষ্টা চালাতো, জনগণের মধ্যে বিভক্তি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতো, সরকারের সঙ্গে জনগণের দূরত্ব সৃষ্টি করত। এভাবে শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিকসহ সব ক্ষেত্রেই অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা চালাতো। অনৈসলামিক এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বা সংগঠনের ওপর ভর করেই শত্রুরা সমস্ত ষড়যন্ত্র বা নীলনক্সা বাস্তবায়নের চেষ্টা চালাতো।

কিন্তু সেই সুযোগ ইরানে নেই এবং বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক, প্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি দিক দিয়ে ইরানকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করলেও এখন পর্যন্ত তারা ব্যর্থ হয়েছে। এটাই হচ্ছে ইসলামি বিপ্লব ও ধর্মভিত্তিক জনগণের শাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বা সাফল্য। বিপ্লব সফল করতে হলে জনগণের মধ্যে আদর্শিক ঐক্য সৃষ্টি করা দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক, আর এ ক্ষেত্রে শিয়া মাজহাবগত কিছু বৈশিষ্ট্য শিয়া ধর্মীয় নেতাদের কাজকে আরো সহজ করে দিয়েছে-যে সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

(খ) প্রচলিত বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইসলামী আন্দোলন

সুন্নি প্রধান মুসলিম দেশগুলোতে ধর্মীয় সংগঠনগুলোর চলমান ইসলামি আন্দোলন বা ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে কখনো কখনো ক্ষমতায় আসা ইসলামপন্থী সরকারের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। যুগের পর যুগ ধরে সুন্নি প্রধান মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামি আন্দোলন চলে আসছে। কিন্তু ইসলামি আন্দোলনকারীরা অসংখ্য দল, মত ও সংগঠনে বিভক্ত। আলেমদের মধ্যে কোনো ঐক্য নেই। তারা ইসলামের বিপ্লবী চেতনা থেকে সরে এসে প্রচলিত বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায় ক্ষমতায় গিয়ে ইসলামি সমাজ কায়েম করার কথা বলে।

ইসলামের উন্নত শিক্ষার প্রভাবে সুন্নি সমাজের দীর্ঘ শত শত বছরের ইতিহাসে ইসলামের বিকাশ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ভৌগোলিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক বড় বড় সফলতার নজির রয়েছে। কিন্তু এসব সাফল্য তারা বেশি দিন ধরে রাখতে পারেনি। এসব সফলতা একটি পর্যায়ে গিয়ে থেমে গেছে এবং পরবর্তী প্রজন্ম এর সুফল ভোগ করতে পারেনি। সুন্নি প্রধান মুসলিম দেশগুলোতে রয়েছে দুটি প্রধান সমস্যা। প্রথম সমস্যা হচ্ছে, ধর্মীয় দলগুলো ও নেতাদের মধ্যে অনৈক্য, একক নেতৃত্বের অভাব ও জন বিচ্ছিন্নতা। আর দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে, বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে ইসলাম কায়েমের নীতি।

বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, কমিউনিস্টসহ বিভিন্ন মতাদর্শের নামে অসংখ্য রাজনৈতিক দলের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। দুর্নীতি, লুটপাট, বৈষয়িক স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা নিয়ে অনৈসলামিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার ঝগড়া-ঝাটি কিংবা সহিংসতায় দেশ ও জাতির ব্যাপক ক্ষতি হলেও ইসলামপন্থীদের তৎপরতা রোধে তারা আবার সবাই ঐক্যবদ্ধ। এ অবস্থায় ইসলামপন্থীরা যদি কখনো কোনো দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনে রাস্তায় নামে তাহলে সন্ত্রাসী ও সহিংসকামী হিসেবে তুলে ধরে তাদের ভাবমূর্তি নষ্টের চেষ্টা করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে কোনো ইসলামপন্থী দলের পক্ষে ক্ষমতায় যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যদি ক্ষমতায় যেতেও পারে তাহলে কি অন্য অনৈসলামিক বা ভিন্ন মতাদর্শের রাজনৈতিক দলগুলো বসে থাকবে? তারা ভেতরের শক্তি ও বাইরের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সহায়তায় যেভাবেই হোক ইসলামি সরকারকে ক্ষতি করার বা তাদের বদনাম করার কিংবা অকার্যকর সরকার হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করবেই।

এ অবস্থায় ইসলাম কায়েমের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় যেতে সক্ষম হলেও ঐ ইসলামি দলটি বেশি দিন ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে না এবং জোর করে তাদেরকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামানোর প্রবণতা দেখা যায়। এ ধরনের দুর্বল ইসলামি সরকার একদিকে যেমন দেশের ভেতরে ইসলামি সমাজ ও ধর্মীয় আইন প্রতিষ্ঠায় পদে পদে বাধার সম্মুখীন হয় অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও নির্যাতিত জাতিগুলো বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের স্বার্থে কিংবা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর অন্যায় ও অপকর্মের বিরুদ্ধে তারা শক্তিশালী কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। কারণ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করতে গেলেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো মুসলিম দেশগুলোতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সহায়তায় ইসলামপন্থী সরকারকে নানাভাবে হয়রানি করবে, নিষেধাজ্ঞা দেবে, সাহায্য বন্ধ করে দেবে, অভ্যুত্থান ঘটাবে এবং পরিশেষে পতন ঘটাবে।

কেউ নিজেদেরকে ইসলামপন্থী দাবি করলে তাদেরকে অবশ্যই সমস্ত অন্যায়ের মোকাবেলা করতে হবে কারণ এটাই ইসলামের শিক্ষা। এ অবস্থায় দেশের ভেতরে ও বাইরে থেকে যে চাপ আসবে তা মোকাবেলা করা তাদের পক্ষে অসম্ভব এবং ইসলামপন্থী সরকার কিছুতেই ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে পারবে না। এ অবস্থায় ইসলামপন্থী দলগুলো শুধুমাত্র অন্য দলগুলোর ক্ষমতায় যাওয়ার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হবে যা খুবই অবমাননাকর ও লজ্জাজনক। কারণ এর ফলে ইসলামপন্থীদের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য বলতে কিছু থাকে না। এ পরিস্থিতি তাদের দৈন্যতারই প্রমাণ।

এ ছাড়া, ধর্ম না থাকার কারণে অনৈসলামিক বা ভিন্ন মতাদর্শের রাজনৈতিক দলগুলোর নীতি-নৈতিকতাবোধ থাকে না, আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার বিষয়টিও থাকে না এবং এরা হয় চরম দুর্নীতি পরায়ণ ও স্বৈরাচার।

নির্বাচনে জিতে যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন তারা কেউই আগের সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয় না। কারণ তারা জানে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হলে নিজেরা যেদিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বাইরে থাকবে সেদিন তাদের বিরুদ্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ অবস্থায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাউকেই অবস্থান নিতে দেখা যায় না এবং ক্ষমতা দখল নিয়ে তারা হানাহানিতে ব্যস্ত থাকে। এ ধরণের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনীতিবিদরা অবৈধ অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়ে তুললেও সাধারণ মানুষের ভাগ্যে কোনো পরিবর্তন হয় না। এরা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে অথচ ধর্মের ধারের কাছেও তারা নেই এবং যতটুকু ধর্মের কথা

বলে বা নামাজ, রোজা, হজ্ব করে তা সম্পূর্ণ লোক দেখানো মাত্র। আর এরাই হচ্ছে আসল ধর্ম ব্যবসায়ী। এরা নিজ স্বার্থে দেশ ও জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না। প্রচলিত রাজনৈতিক দলের কোনো কোনো নেতা সৎ চরিত্রের হলেও অসৎ চরিত্রের রাজনীতিবিদদের শ্রোতের তোড়ে তারা ভেসে যান। ইসলামপন্থীরা আল্লাহকে ভয় করার কারণে তাদের মধ্যে অনেক সততা কাজ করে। এ অবস্থায় কোনো ইসলামি দল ক্ষমতায় থাকলে স্বাভাবিকভাবেই দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের সুযোগ সীমিত হয়ে আসে এবং যেভাবেই হোক নিজেদের স্বার্থে ইসলামি সরকারের পতন ঘটানোর চেষ্টা করে। এর বড় উদাহরণ হচ্ছে, মিশর পরিস্থিতি।

এত দীর্ঘ বছর ধরে সংগ্রাম ও ত্যাগ তিতিক্ষার পর মিশরে ইসলামপন্থীরা সরকার প্রতিষ্ঠা করলেও তারা প্রচলিত বহু আদর্শিক বা বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাইরে যেতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত তাদের পতন ঘটেছে। মিশরে ইসলামপন্থীরা ক্ষমতায় গেলেও স্বাধীনভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার মত অবস্থায় তারা ছিল না। প্রচলিত বহু দলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যে সম্ভব নয় তার প্রমাণ মিশর। ইসলামপন্থীরা মিশরে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ পেলেও সেক্যুলারপন্থী ও পাশ্চাত্য ঘেঁষা বিরোধী রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে দেশটির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশিরা হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পেয়েছে। বিদেশিরা মিশরের অনৈসলামিক দলগুলোর সহায়তায় এমনভাবে ইখওয়ানের নেতৃত্বে ইসলামপন্থী সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে যে, শেষ পর্যন্ত তারা ক্ষমতায় বেশিদিন থাকতে পারেনি।

মিশরের প্রেসিডেন্ট মুরসি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ বলেছিলেন, 'মিশরের ঘটনায় ইসলামের নামে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ভ্রান্ত রাজনীতির ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয়েছে।' প্রেসিডেন্ট আসাদের এ বক্তব্য থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্য থেকে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সুন্নি প্রধান সব মুসলিম দেশগুলোর একই অবস্থা। এ থেকে প্রমাণিত হয়, প্রচলিত বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ইরানের মত ইসলামি বিপ্লবী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প মুসলিম বিশ্বের সামনে নেই। শত শত বছর ধরে ধরে চলে আসা সুন্নি মুসলিম বিশ্বের এ দুরবস্থার পেছনে ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় কারণ রয়েছে।

বিশেষ নিবন্ধ

মুসলিম উম্মাহ্‌র সমস্যা : কারণ ও সমাধান

মুসলিম উম্মাহ্‌র সমস্যা : কারণ ও সমাধান

নূর হোসেন মজিদী

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ্ এক কঠিন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। একদিকে তার সামনে আছে এক বিরাট সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা ও তার বাস্তব রূপ লাভের শক্তিশালী প্রত্যয় অন্যদিকে গোটা উম্মাহ্ বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় জর্জরিত। তাদের আশা ও নিশ্চিত প্রত্যয়ের সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে উম্মাহ্‌র সর্বসম্মত 'আক্বীদা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.[১])-এর আবির্ভাব এবং বিশ্ববিপ্লব সংগঠন ও বিশ্ব ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা – যা বিপুল সংখ্যক হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওপর ভিত্তিশীল এবং তা মাযহাব্ ও ফির্‌ক্বাহ্ নির্বিশেষে সমগ্র উম্মাহ্‌র মতৈক্যের বিষয়সমূহের অন্যতম।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাব সংক্রান্ত মুসলিম উম্মাহ্‌র ইয়াক্বীনী 'আক্বীদাহ্ সম্বন্ধে কেবল এতোটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, শিয়া ও সুন্নি উভয় সূত্রের হাদীছসংকলন সমূহের একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাব ও তৎপরতা সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী এবং এ সব ভবিষ্যদ্বাণী পরস্পর পরিপূরক; এগুলোতে কোনো স্ববিরোধিতা নেই। তবে শিয়া ধারার হাদীছ সমূহে যেখানে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর আহ্‌লে বাইতের ধারাবাহিকতার একাদশ ইমাম হযরত হাসান 'আস্‌কারী (আ.)-এর পুত্রই ইমাম মাহ্‌দী বলে উল্লেখ করা হয়েছে – যিনি পাঁচ বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর গোপন স্থানে চলে যান এবং তাঁর পিতার চার জন ঘনিষ্ঠ শিষ্যের মাধ্যমে স্বীয় ভক্ত ও অনুসারীদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন, অতঃপর উক্ত চার জন ব্যক্তির ইন্তেকালের পর আত্মপরিচয় প্রকাশ না করে সমাজে অবস্থান করছেন, আর আল্লাহ্ তাঁকে দীর্ঘজীবী করেছেন, সেখানে সুন্নি ধারার হাদীছ সমূহ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর জন্ম ও তার স্থান-কাল এবং আবির্ভাব পূর্ব জীবন সম্পর্কে নীরব। জন্মগ্রহণ করে থাকুন বা না থাকুন,

---

[১] عجل الله فرجه الشريف. – "আল্লাহ্ সেই মহান ব্যক্তির আবির্ভাব ত্বরান্বিত করুন।"

যেহেতু তিনি বর্তমানে সমাজে স্বীয় পরিচয় সহ নেই সেহেতু তাঁর আনুগত্য করা বা না করার প্রশ্নটি এখন প্রাসঙ্গিক নেই; কেবল তাঁর আবির্ভাবের পরই, তাঁর ইমাম মাহ্দী (আ.) হওয়ার ব্যাপারে হুজ্জাত্ পরিপূর্ণ হবে বিধায় তখন ঈমান ও কুফ্র্ তাঁর আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল হবে।

কিন্তু উম্মাহ্র আজকের দিনের সমস্যাবলী সম্পর্কে এতো সংক্ষেপে আলোকপাত করা সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে কথা বলতে হলে একদিকে যেমন এ সব সমস্যার বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে তেমনি কেবল তার মূল কারণ উদ্ঘাটনের পরেই তার সমাধান নির্দেশ করা সম্ভব। আমরা এখানে মায্হাবী ও ফির্কাহ্গত সঙ্কীর্ণতার উর্ধে থেকে যথাসম্ভব সংক্ষেপে সমস্ত মুসলমানের কাছে অভিন্ন অপিরিহার্যভাবে গ্রহণযোগ্য মানদ-র ভিত্তিতে এ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করবো এবং আশা করবো ইখলাছের অধিকারী চিন্তাশীল ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ নির্মোহভাবে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করবেন এবং যে কোনো ভিন্নমত নির্দ্বিধায় প্রকাশ করবেন।

বিরাজমান সমস্যাবলীর ওপর সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিপাত

বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা মোটামুটি সাতশ' কোটির মতো এবং বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে অত্র নিবন্ধকার কৃত হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে বিশ্বে মোট মুসলিম জনসংখ্যা কমপক্ষে পৌনে দু'শ' কোটি তথা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ। অন্যদিকে বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে কম পক্ষে ৪৮টি দেশে মুসলমানরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং আরো সাত-আটটি বহুজাতিক দেশে তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী। মুসলিম প্রধান দেশসমূহের রয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ বিশাল ভূখ-। কিন্তু এতো কিছু সত্ত্বেও মুসলমানরা ক্ষুধা-দারিদ্র, অশিক্ষা, অনুন্নয়ন, সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতা, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, বিভেদ -অনৈক্য, গৃহযুদ্ধ, বিজাতীয়দের দখলদারী ও সার্বিক ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীলতা ইত্যাদি সমস্যায় জর্জরিত।

মুসলমানদের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর ব্যাপ্তি ও গভীরতা যতো বেশীই হোক না কেন সে তুলনায় তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলো অধিকতর বিপর্যয়কর, বিশেষতঃ এ কারণে যে, তাদের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলো থেকে উদ্ভূত। নইলে মুসলমানরা যে প্রভূত

প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পর্দের অধিকারী তার যথাযথ ও ইসলাম- সম্মত ব্যবহার করা হলে মুসলিম উম্মাহ্‌র আদৌ কোনো অর্থনৈতিক সমস্যা থাকার কথা নয়। বিশেষ করে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনীদের তালিকায় যখন কতক মুসলমানের নামও দেখা যায় যাদের প্রত্যেকে বহু বিলিয়ন ডলার পরিমাণ সম্পদ ও পুঁজির মালিক সে ক্ষেত্রে বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে ক্ষুধা- দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অনুন্নয়ন থাকার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীর কারণে এ সব অঢেল প্রাকৃতিক ও অ-প্রাকৃতিক সম্পদ তাদের ভাগ্যোন্নয়নে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না।

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী এবং তার মূল

মুসলিম উম্মাহ্‌র বিদ্যমান রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী হচ্ছে মায্‌হাবী ও ফির্‌ক্বাহ্‌গত সঙ্কীর্ণতা এবং নেতৃত্ব- কর্তৃত্ব ও শোষণ- লুণ্ঠনের লোভ জনিত বিভেদ-অনৈক্য ও গৃহযুদ্ধ – যার পিছনে রয়েছে ইসলামের চিরদুশমন পাশ্চাত্য জগতের ষড়যন্ত্র এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। আর এ ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়নকারী হচ্ছে উম্মাহ্‌র ওপরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের চাপিয়ে দেয়া তাদেরই বশংবদ অথবা সজ্ঞানে বা অজ্ঞাতসারে তাদেরই খেদমতে নিয়োজিত রাজতান্ত্রিক, সামরিক ও তথাকথিত গণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী শাসকবর্গ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী সমূহ। এর ফলে মুসলিম উম্মাহ্‌র চেতনাগত ও বাস্তব ঐক্য বলতে গেলে মোটেই অবশিষ্ট নেই।

বিজাতীয় আগ্রাসন ও অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ফলে বিগত কয়েক দশকে মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রচুর রক্ত ঝরেছে এবং বর্তমানেও রক্তঝরা অব্যাহত রয়েছে – যার ফিরিস্তি প্রদান অত্র আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক হলেও সীমিত পরিসরে তা সম্ভব নয়। বর্তমানে যে সব ক্ষেত্রে মুসলমানদের রক্ত ঝরছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ফিলিস্তিনের মাটিতে জবর দখল করে প্রতিষ্ঠিত অবৈধ যায়ন্‌বাদী রাষ্ট্র ইসরাঈল কর্তৃক ফিলিস্তিনীদের হত্যা অব্যাহত থাকা, সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ, মিসরের সামরিক শাসকদের দ্বারা সেখানকার দ্বীনদার মুসলমানদের হত্যা এবং ইরাকে ও পাকিস্তানে প্রায়ই সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়ে শিয়া মায্‌হাবের অনুসারীদের হত্যা।

ফিলিস্তিন প্রশ্নে মুসলিম উম্মাহ্‌র নৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থান

বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মস্‌জিদুল্ আক্বছা ইসলামের প্রথম ক্বিব্‌লাহ্ এবং হযরত রাসূলে আকরাম (গা.) এখানকার পবিত্র প্রস্তরের ওপর থেকে তাঁর মি'রাজের সফরে গমন করেন। ইসলামের সকল মায্‌হাব্ ও ফির্‌ক্বাহ্‌র অভিন্ন মত (ইজ্‌মা') অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিশেষ পবিত্রতার অধিকারী তিনটি মসজিদ হচ্ছে, কা'বাহ্ সহ মস্‌জিদুল্ হারাম, মস্‌জিদুন্নবী ও মস্‌জিদুল আক্বছা। তাই মসজিদুল আক্বছার সাথে রয়েছে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌র বিশেষ আত্মিক সম্পর্ক। অন্যদিকে কোরআন মজীদের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা অনুযায়ী সমগ্র ফিলিস্তিন ভূখ-ই পবিত্র ভূমি (সূরা আল্-মায়েদা ঃ ২১)। তাই শুধু বায়তুল মুক্বাদ্দাসই নয়, বরং সমগ্র ফিলিস্তিন ভূখ-ের জন্য মুসলিম উম্মাহ্‌র বিশেষ দ্বীনী ও নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে।

ঐতিহাসিক সত্য হলো এই যে, মুসলমানরা কোনো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ফিলিস্তিন ভূখ- দখল করে নি এবং পূর্ববর্তী অধিবাসীদেরকে উৎখাত করে এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী হয় নি। বরং এখন থেকে প্রায় চৌদ্দ শতাব্দী কাল পূর্বে এক রক্তপাতহীন সন্ধির মাধ্যমে তারা এ ভূখ-ের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে এবং এ ভূখ-ের আদি অধিবাসী কেন্'আানী আরবরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করায় এ ভূখ- মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূখ-ে পরিণত হয়। কিন্তু সুদীর্ঘ মুসলিম শাসনামলে সব সময়ই এখানে স্থানীয় ইয়াহূদী ও খৃস্টান অধিবাসীগণ নিরাপত্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারী ছিলো এবং সেই সাথে বাইরের ইয়াহূদী- খৃস্টানরা সব সময়ই বায়তুল মুক্বাদ্দাস্ যিয়ারতের অধিকার লাভ করে।

কিন্তু আন্তর্জাতিক যায়ন্‌বাদী গোষ্ঠী ও বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির ষড়যন্ত্রে প্রথমে তুর্কী জাতীয়তাবাদ ও তথাকথিত নব্য তুর্ক আন্দোলনের সৃষ্টি ও পরে আরব জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠার পরিণতিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে তৎকালে মুসলিম জাহানের ঐক্যের প্রতীক খলীফাহ্ হিসেবে পরিগণিত তুর্কী 'উছ্‌মাানী সুলতানের শাসনের বিরুদ্ধে আরব জাহানে সংঘটিত রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহ ও বৃটিশদের পক্ষে বিদ্রোহীদের যুদ্ধের পরিণতিতে সমগ্র আরব ভূখ- বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ও তার বিশ্বযুদ্ধকালীন মিত্র ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ উপনিবেশে পরিণত হয়। অতঃপর বৃটিশ সরকার মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্যরূপ মেরুদ-কে পুরোপুরি ভেঙ্গে ফেলার লক্ষ্যে আরব জাহানকে টুকরো টুকরো করে প্রায় দেড় ডজন স্বতন্ত্র তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করে – যার কয়েকটি টুকরা ফ্রান্সকে উপহার দেয় এবং বাকীগুলো স্বীয় নিয়ন্ত্রণে রাখে,

বিশেষভাবে ফিলিস্তিনকে তাবেদার রাষ্ট্রেও পরিণত না করে বৃটেনের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে রেখে দেয়। অতঃপর যায়নবাদীরা বৃটেনের মদদে সারা দুনিয়া থেকে অ-ফিলিস্তিনী ইয়াহূদীদের এনে ফিলিস্তিনে জড়ো করতে থাকে। সশস্ত্র যায়ন্‌বাদী সন্ত্রাসীরা ফিলিস্তিনী জনগণকে উৎখাত করে ফিলিস্তিনের বুকে বহিরাগত ইয়াহূদীদের বসতি প্রতিষ্ঠা করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তারা বৃটেন, আমেরিকা ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ বৃহৎ শক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় ফিলিস্তিনের বুকে অবৈধ যায়ন্‌বাদী রাষ্ট্র ইসরাঈল প্রতিষ্ঠা করে। পরে (১৯৬৭) তারা ফিলিস্তিনের অবশিষ্ট ফিলিস্তনী অধ্যুষিত এলাকাও গ্রাস করে নেয়।

ফিলিস্তিনী জনগণ কখনোই ফিলিস্তিনের বুকে অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত যায়ন্‌বাদী ও ইয়াহূদী বর্ণবাদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের অস্তিত্বকে মেনে নেয় নি, বরং ইসরাঈলের উৎখাত এবং যায়নবাদীদের দ্বারা বহিষ্কৃত ফিলিস্তনীদের ও তাদের বংশধরদের প্রত্যাবর্তন সহ সমগ্র ফিলিস্তিন ভূখ-ের ওপর ধর্ম- বর্ণ ও বংশ- গোত্র নির্বিশেষে সকল প্রকৃত ফিলিস্তিনী ও তাদের বংশধরদের সমানাধিকার ও সর্ব ধর্মের স্বাধীনতা ভিত্তিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে আসছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ১৯৯৩ সালে তৎকালীন ফিলিস্তিনী রাজনৈতিক নেতৃত্ব ফিলিস্তিনী জনগণ ও মুসলিম উম্মাহ্‌র আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে ফিলিস্তিনের দু'টি ক্ষুদ্র অংশে ইসরাঈলী সার্বভৌমত্বের অধীনে তথাকথিত স্বায়ত্তশাসন লাভের বিনিময়ে অবৈধ যায়ন্‌বাদী রাষ্ট্র ইসরাঈলকে স্বীকৃতি প্রদান ও সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের অবসান ঘোষণা করেন। কিন্তু ফিলিস্তিনী জনগণ জিহাদে ইসলামী বায়তুল মাক্বদেস্ ও হামাসের নেতৃত্বে সমগ্র ফিলিস্তিন ভূখ-ে স্বাধীন- সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখে এবং এক সময় গাযাহ্ ভূখ-ের ওপর হামাসের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বলা বাহুল্য যে, বায়তুল মুক্বাদ্দাস্ সহ সমগ্র ফিলিস্তিনের পুনরুদ্ধার সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌র ঈমানী দায়িত্ব এবং এ দায়িত্ব ফিলিস্তিনের প্রতিবেশী মুসলিম প্রধান দেশগুলোর সর্বাধিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক এই যে, কোনো দেশই এ দায়িত্ব পুরোপুরি পালনের জন্য অগ্রসর হয় নি। কেবল হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লব বিজয়ী হবার পর ইরানের ইসলামী সরকার যায়ন্‌বাদী ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতি পূর্ববর্তী শাহী সরকারের দেয়া স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেয় এবং সমগ্র ফিলিস্তিন ভূখ- জুড়ে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করে।

অন্যদিকে ইসলামী বিপ্লবের প্রেরণা এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সরকারের সহযোগিতায় জিহাদে ইসলামী বায়তুল মাক্বদেস্ ও হামাস্ আন্দোলন গড়ে ওঠে। এছাড়া দক্ষিণ লেবাননের শিয়া মুসলমানগণও হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে একই লক্ষ্যে হিয্বুল্লাহ্ নামক সামাজিক- রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠন গড়ে তোলে এবং যায়ন্বাদী ইসরাঈলের বিরুদ্ধে কঠোর ও অপ্রতিরোধ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এছাড়া ফিলিস্তিনের প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একমাত্র সিরিয়া ইসরাঈলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকে, যদিও প্রথমে মিসর ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দেয় ও পরে একের পর এক অন্যান্য দেশও ইসরাঈলকে প্রত্যক্ষভাবে বা (বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে) পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। আর এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই ফিলিস্তিন সীমান্ত থেকে দূরে অবস্থানকারী মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশগুলোরও বেশীর ভাগই আরব দেশগুলোর পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

এমতাবস্থায় ফিলিস্তিন সীমান্ত থেকে দূরে অবস্থানকারী ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পক্ষে ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য ফিলিস্তিনী জনগণকে, বিশেষতঃ হামাস্কে ও লেবাননের হিয্বুল্লাহ্কে বস্তুগত ও অবস্তুগত সব ধরনের সাহায্য প্রদান, সিরিয়াকে ফিলিস্তিনী জনগণের পক্ষে ধরে রাখার জন্য বস্তুগত সহায়তা প্রদান এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে বায়তুল মুক্বাদ্দাস্ সহ সমগ্র ফিলিস্তিনের মুক্তির ক্ষেত্রে ঈমানী দায়িত্বের কথা উপর্যুপরি স্মরণ করিয়ে দেয়া ছাড়া আপাততঃ আর কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না।

কিন্তু চরম দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এই যে, কেবল ফিলিস্তন মুক্তি সংস্থা (পিএলও)-ই নয়, বরং যে হামাস্ আন্দোলন ইসলামী বিপ্লবের প্রেরণায় ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বাত্মক সহযোগিতায় গড়ে উঠেছিলো সে হামাস-ও বহুলাংশে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং ফিলিস্তিনের অংশবিশেষের ওপর খ-িত ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে ইসরাইলের অস্তিত্ব মেনে নেয়ার ব্যাপারে সবুজ সঙ্কেত প্রদান করেছে। কিন্তু তৎকালীন পিএলও- চেয়ারম্যান ইয়াসীর্ 'আরাফাত্ কর্তৃক ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করে যায়ন্বাদী ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দেয়ার পর বিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সেই (খ-িত) তথাকথিত স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ইসরাঈল ও তার সাম্রাজ্যবাদী মুরুব্বী আমেরিকার প্রস্তুত

হওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহ্‌র সম্মিলিত সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ইসরাঈলকে উৎখাত ছাড়া ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধানের আদৌ কোনো পথ খোলা নেই – এটা নিশ্চয়তার সাথেই বলা যেতে পারে।

সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ

এটা সর্বজনবিদিত যে, সিরিয়ার চলমান গৃহযুদ্ধ আমেরিকার ষড়যন্ত্রের ফসল এবং তার লক্ষ্য হচ্ছে যায়ন্‌বাদী ইসরাঈলকে অধিকতর নিরাপদ করা। কারণ, সিরিয়া হচ্ছে ফিলিস্তিনের প্রতিবেশী একমাত্র আরব রাষ্ট্র যে ফিলিস্তিনীদের মুক্তিসংগ্রামকে শুরু থেকে সমর্থন জানিয়ে আসছে এবং কখনোই আমেরিকার টোপ গিলে এ পথ থেকে বিচ্যুত হয় নি। এছাড়া সিরিয়া আরব দেশগুলোর মধ্যে সামরিক দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী।

ইরানে ইসলামী বিপ্লব বিজয়ী হওয়ার পর থেকেই ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান ফিলিস্তিনী জনগণের সপক্ষে ও যায়ন্‌বাদী ইসরাঈলের কবল থেকে সমগ্র ফিলিস্তিন ভূখ- মুক্ত করার লক্ষ্যে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে। বলা বাহুল্য যে, এ ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনের প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর ভূমিকাই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বের অধিকারী। কারণ, তাদের সহায়তা ছাড়া মুসলিম উম্মাহ্‌র পক্ষে ফিলিস্তিন মুক্তির লক্ষ্যে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ইরান সরকার লেবাননের হিয্‌বুল্লাহ্‌কে গড়ে তোলা ও ফিলিস্তিনীদেরকে জিহাদে ইসলামী বায়তুল্‌ মাক্বদেস্‌ ও হামাসের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হবার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হলেও এবং সিরিয়াকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে ফিলিস্তিনের পক্ষে ও ইসরাঈলের বিরুদ্ধে ধরে রাখতে সক্ষম হলেও ফিলিস্তিনের প্রতিবেশী বাকী সবগুলো আরব রাষ্ট্রই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইসরাঈলের অস্তিত্বকে মেনে নেয়।

বলা বাহুল্য যে, সিরিয়া একটি মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশ হলেও কোনো ইসলামী রাষ্ট্র নয় এবং সিরিয়ার সরকারও কোনো ইসলামী সরকার নয়, বরং বিশ্বের আরো অনেক মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশের ন্যায় দেশটির সরকার একটি ধর্মসম্পর্করহিত (সেক্যুলার) সরকার। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান কেবল ফিলিস্তিনের স্বার্থে সিরিয়াকে সহায়তা দিয়ে আসছে। এখানে ইসলামী ইরানের দৃষ্টিতে সিরিয়ার বিষয়টি

ফিলিস্তিন মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী গোষ্ঠীগুলোর অন্যতম খৃস্টান নেতা জর্জ হামাসের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীটির অনুরূপ। বিষয়টিকে কারো ঘরে আগুন লাগলে তা নিভাবার জন্য ভালো-মন্দ যে কারো সাহায্যকে স্বাগত জানানোর সাথেও তুলনা করা যেতে পারে। কারণ, এখানে অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত। যেহেতু ফিলিস্তিন প্রশ্নে ফিলিস্তিনের মুক্তিই মুখ্য বিষয় সেহেতু এ মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী মুসলিম কি অমুসলিম তা বিবেচ্য বিষয় হতে পারে না, ঠিক একইভাবে যে কোনো রাষ্ট্র ও সরকার – তা ইসলামী হোক বা না-ই হোক (যদিও বর্তমানে বাস্তবে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান ছাড়া আর কোনোই ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের কোথাও অস্তিত্ব নেই) – ফিলিস্তিনের সপক্ষে দাঁড়াবে তার ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া বা না হওয়া বিবেচ্য হতে পারে না।

এহেন পরিস্থিতিতে আমেরিকার পক্ষ থেকে দু'টি পথে সিরিয়ার ইসরাঈল- বিরোধী সরকারকে উৎখাতের ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম সামরিক শক্তি হিসেবে দেশটির ধ্বংস সাধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। একদিকে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ সুদীর্ঘকালীন ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতার মাধ্যমে সিরিয়ার সরকার ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে তাদের একটা অংশকে কিনে নিতে সক্ষম হয় এবং তাদের দ্বারা মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের শ্লোগান তুলে বিদ্রোহের সূচনা করে যদিও এ সব লোক দীর্ঘকাল যাবত সিরিয়া সরকারের অংশ হিসেবে এ সরকারের সকল কাজেই অংশীদার ছিলো। অন্যদিকে সিরিয়ার বাইরে থেকে আমেরিকার সৃষ্ট ও মদদপুষ্ট আল্-ক্বায়েদাহ্, ত্বালেবান ও অন্যান্য চরমপন্থী সংগঠনের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শ্লোগান তুলে সিরিয়ায় প্রবেশ করে দেশটির সরকার ও জনগণের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবতারণা করে। সিরিয়ার এ গৃহযুদ্ধে ইতিমধ্যেই কম পক্ষে এক লাখ বিশ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে এবং ধ্বংস হয়েছে হাজার হাজার কোটি ডলারের সম্পদ।

সন্ত্রাস কি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পন্থা?

আল্-ক্বায়েদাহ্র নেতৃত্বাধীনে যে সব সন্ত্রাসী সংগঠন সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে তারা ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার শ্লোগান তুলছে এবং এর দ্বারা অগভীর চিন্তার অধিকারী অনেক সরলমনা মুসলমান বিভ্রান্ত হচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে প্রথমেই যে প্রশ্নটি জাগে, তা হচ্ছে সশস্ত্র সন্ত্রাসী তৎপরতা কি ইসলাম ও ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পন্থা? সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, এটা ইসলাম- সম্মত

পন্থা নয় এবং এ কারণে এর দ্বারা ইসলাম বা ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে না। কারণ, কোরআন মজীদে সুস্পষ্ট ভাষায় এরশাদ হয়েছে ঃ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ – "দ্বীনে (দ্বীন গ্রহণের ক্ষেত্রে) কোনো জবরদস্তি নেই।" (সূরা আল্-বাক্বারাহ্ ঃ ২৫৬) আল্লাহ্ তা'আলা হযরত রাসূলে আকরাম (গা.)কে সম্বোধন করে এরশাদ করেন ঃ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ. – "অতএব, (হে রাসূল!) স্মরণ করিয়ে দিন, নিঃসন্দেহে আপনি স্মরণ করিয়ে দেয়ার দায়িত্বশীল; আপনি তাদের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকারী নন।" (সূরা আল্-গ্বাশীয়াহ্ ঃ ২১- ২২) আল্লাহ্ তা'আলা আরো এরশাদ করেন ঃ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ. – "আর রাসূলের ওপর (আল্লাহ্‌র বাণী) সুস্পষ্ট ভাষায় পৌঁছে দেয়া ছাড়া কোনো দায়িত্ব নেই।" (সূরা আন্-নূর্ ঃ ৫৪) এ কথাটি আরো অনেকগুলো আয়াতে বলা হয়েছে।

এ কারণে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) মক্কায় জোর করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা তো দূরের কথা আঘাতের জবাবে প্রত্যাঘাত করার জন্যও মুসলমানদেরকে অনুমতি দেন নি। তিনি কেবল মদীনায় যাবার পরে সেখানকার জনগণ, ন্যূনকল্পে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব মেনে নিলে তিনি সেখানে দ্বীনী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন।

ইসলামের নামে গড়ে ওঠা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলো "জিহাদ" শব্দের মনগড়া অর্থ করছে। তারা তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতাকে "জিহাদ" বলে দাবী করছে। অথচ প্রকৃত পক্ষে "জিহাদ" একটি ব্যাপক তাৎপর্যবহ শব্দ যার মূল অর্থ 'সর্বাত্মক প্রচেষ্টা' এবং বিশেষ পারিভাষিক অর্থ 'সশস্ত্র যুদ্ধ'। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. – "অতএব, (হে রাসূল!) কাফেরদের মেনে নেবেন না এবং এর (কোরআনের) সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে শ্রেষ্ঠ জিহাদ করুন (মোকাবিলা করুন)।" (সূরা আল্-ফুর্ক্বান্ ঃ ৫২) আর যে সব আয়াতে "জিহাদ" বলতে 'সশস্ত্র যুদ্ধ' বুঝানো হয়েছে সে সব আয়াত ইসলামী হুকুমতের প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। তাই এ সব আয়াত মদীনায় ইসলামী হুকুমত ক্বায়েমের পরে নাযিল হয়েছে – এটাই সর্বসম্মত মত এবং হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর আমলও প্রমাণ করে যে, সশস্ত্র জিহাদ কেবল ইসলামী হুকুমতের প্রতিরক্ষার জন্য, ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) যে সব ক্ষেত্রে আক্রান্ত হওয়ার আগেই অগ্রবর্তী হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করেছেন সেগুলোও

শত্রুর আক্রমণপ্রস্তুতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে করেছেন এবং তা-ও ইসলামী হুকুমতের প্রতিরক্ষার লক্ষ্যে, ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছিলো না।

যুদ্ধ সিরিয়ায় কেন?

সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে মদদদানকারী পাশ্চাত্য ও আরো অনেকে যে গণতন্ত্রের শ্লোগান তুলছে এবং ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনাকারী গোষ্ঠীগুলো ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে "জিহাদ" করছে বলে যে দাবী করছে আমরা যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেই যে, তা যথার্থ সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, এটা সিরিয়ায় কেন; অন্য কোনো দেশে নয় কেন?

বিশ্বে এমন বহু দেশেই গণতন্ত্র অনুপস্থিত ও মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে যেখানে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পাশ্চাত্য না কোনো শ্লোগান তোলে, না সে সব দেশের গণতন্ত্রকামী আন্দোলনগুলোকে সহায়তা করে, কারণ, ঐ সব দেশের সরকারগুলো পাশ্চাত্যের তথা আমেরিকার বশংবদ। তাই উল্টো ঐ সব দেশে গণতন্ত্রকামী জনমতকে দমন করার জন্য আমেরিকা সংশ্লিষ্ট সরকারগুলোকে প্রয়োজনীয় সমস্ত রকমের সাহায্য প্রদান করে থাকে। অনুরূপভাবে বিশ্বের বহু মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশে ইসলামী হুকুমত নেই, বরং রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, কিন্তু আল্-ক্বায়েদাহ্ ও ত্বালেবানের মতো সংগঠনগুলো ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য ঐ সব দেশে গিয়ে যুদ্ধ করছে না, কারণ, সে সব দেশের সরকারগুলো আমেরিকার বশংবদ। এ ব্যাপারে প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে বাহ্রাইন।

বাহ্রাইনে না গণতন্ত্র আছে, না আছে ইসলামী হুকুমত। দেশটির মুসলিম জনগণ সেখানে অভ্যুত্থান করেছিলো ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। কিন্তু পাশ্চাত্য বা কথিত জিহাদী সংগঠনগুলো তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে যায় নি, এমনকি তাদের প্রতি নৈতিক সমর্থনও দেয় নি। শুধু তা-ই নয়, সেখানকার সরকার এ অভ্যুত্থান দমনে ব্যর্থ হলে একটি প্রতিবেশী দেশ সেনাবাহিনী পাঠিয়ে এ গণ- অভ্যুত্থানকে নির্মমভাবে দমন করে। কিন্তু অন্য একটি দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এ ধরনের গণবিরোধী সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তারা কোনোই উচ্চবাচ্য করে নি।

নিঃসন্দেহে আল্-ক্বায়েদাহ্ ও ত্বালেবানের মতো সংগঠনগুলো বাহ্‌রাইনে গিয়ে যুদ্ধ করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠায় সেখানকার জনগণকে সহায়তা করতে পারতো। অথবা তারা ইসলামের প্রথম ক্বিবলাহ্‌কে মুক্ত করার লক্ষ্যে ফিলিস্তিনে গিয়ে যায়ন্‌বাদী ইসরাঈলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারতো। কিন্তু তারা তা না করে সিরিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, কারণ, সিরিয়ার সরকার যায়ন্‌বাদী ইসরাঈলের দুশমন।

ইসলামের নামে সন্ত্রাসবাদের উৎস ও তা গড়ে তোলার উদ্দেশ্য

এটা সর্বজনবিদিত এবং অকাট্য তথ্যপ্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত যে, ইসলামের নামে যে সব সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তৎপরতা চালাচ্ছে সেগুলো সম্রাজ্যবাদী আমেরিকা কর্তৃক তার নিজের স্বার্থে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ত্বালেবানের কথা বলা যেতে পারে। ইরান ও আফগানিস্তানে আশ্রয়গ্রহণকারী আফগানদের মধ্যকার মুজাহিদ গ্রুপগুলো যখন দখলদার সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলো তখন আফগান মুহাজিরদের মধ্যকার দ্বীনী মাদ্রাসাহ্‌র ছাত্ররা (ত্বালেবান্) যথাসময়ে বিভিন্ন মুজাহিদ গ্রপে যোগদান করতো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমেরিকার উদ্যোগে পাকিস্তানস্থ আফগান ছাত্রদের নিয়ে স্বতন্ত্র ত্বালেবান্ বাহিনী গঠন করা হয়। পরবর্তীকালে সোভিয়েত বাহিনীর বিদায়ের পরে এ ত্বালেবান্ একটি স্বতন্ত্র শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

পাকিস্তান কেন্দ্রিক আফগান মুজাহিদ গ্রুপগুলো মার্কিন সাহায্য গ্রহণ করায় তাদের মধ্যে সিআইএ অনুপ্রবেশ করতে পেরেছিলো এবং সিআইএ শুধু ত্বালেবান্ গঠন করেই ক্ষান্ত থাকে নি, বরং আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদায়ের পরে মুজাহিদ গ্রুপগুলোর মধ্যে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। কিন্তু কোরআন মজীদে যেখানে দুই দল মুসলমানের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেলে অন্য মুসলমানদেরকে উভয়ের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়ার এবং কোনো এক পক্ষ এর পরও অন্য পক্ষের ওপর চড়াও হলে তখন কেবল তার বিরুদ্ধে সবাই মিলে যুদ্ধ করার, অতঃপর সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে এলে তাদের মধ্যে ন্যায় নীতির ভিত্তিতে ফয়সালা করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে (সূরা আল্-হুজুরাত্ ঃ ৯) সেখানে ত্বালেবান্ উভয় পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং বহু মুসলমানকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করে।

কিন্তু এর ফলে আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ বন্ধ না হয়ে কেবল দীর্ঘায়িত হয়। পরে টুইন্ টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনায় সন্তোষ প্রকাশকারী আল্-ক্বায়েদাহ্- নেতা ওসামা বিন্ লাদেনকে আশ্রয় দেয়ার বিষয়টিকে বাহানা করে আমেরিকা আফগানিস্তানের ওপর হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চাপিয়ে দেয় – আজো যার পুরোপুরি অবসান হয় নি।

এটা আজ দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, আল্-ক্বায়েদাহ্ ও ত্বালেবান্ সহ ইসলামের নামে যে সব সন্ত্রাসবাদী সংগঠন গড়ে উঠেছে সেগুলোর প্রতিটিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুসলিম উম্মাহ্র ধ্বংসের লক্ষ্যে আমেরিকার ষড়যন্ত্রের পরিণতিতে গড়ে উঠেছে এবং যার পিছনে চারটি উদ্দেশ্য নিহিত দেখা যায় ঃ (১) মুসলমানদের দ্বারা মুসলমানদেরকে হত্যা করানো, (২) এ সব গোষ্ঠীর মধ্য থেকে যে কোনোটি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠলে কোনো না কোনো বাহানায় তাদেরকে নির্মূল করা – ঠিক যেভাবে ত্বালেবান্ ও আল্-ক্বায়েদাহ্র বেলায় ঘটেছে – ও এভাবে বিশেষতঃ দ্বীনী জয্বাহ্ ও ইখলাছের অধিকারী মুসলিম যুবশক্তিকে নিশ্চিহ্নকরণ, (৩) এদের সন্ত্রাসবাদী তৎপরতাকে বাহানা হিসেবে ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী সাধারণভাবে মুসলমানদেরকে এবং বিশেষভাবে দ্বীনী প্রচার-প্রসারে তৎপর ইসলামী সংগঠন ও আন্দোলন সমূহকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করে ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে অমুসলিমদের মধ্যে আতঙ্ক ও ঘৃণা সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলামের প্রচার- প্রসারকে ব্যাহত করা এবং (৪) ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহ্র ঘৃণ্যতম দুশমন যায়ন্বাদী ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষম শক্তিকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে যায়ন্বাদী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা অধিকতর নিশ্চিত করা।

সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ ঃ ইখওয়ান্ ও হামাসের ভূমিকা

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো ইসরাঈলের বিরুদ্ধে সিরিয়ার দৃঢ় অবস্থানের কথা জানা থাকা সত্ত্বেও মিসরের ইখওয়ানুল্ মুসলিমীন্ ও প্রেসিডেন্ট মুর্সীর নেতৃত্বাধীন তৎকালীন ইখওয়ান্ সরকার এবং গাযাহ্র হামাস্ আন্দোলন ও সরকার সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে সরকার বিরোধী বিদ্রোহীদের প্রতি সমর্থন জানায়, অথচ এটা দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে, সেখানে যদি বিদ্রোহীরা সফলও হয় তো সেখানে আমেরিকার মদদপুষ্ট সেক্যুলার গোষ্ঠী শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে – অতীতে যারা ছিলো সিরিয়া-সরকারের সুবিধাভোগী এবং কথিত জিহাদী গোষ্ঠীগুলো কখনোই সেখানে তাদের কাঙ্খিত ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাবে না, বরং মার্কিন সহায়তায় সেক্যুলার

গোষ্ঠী তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অন্যদিকে সিরিয়া সরকারের প্রতি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সমর্থনের কারণে ইখওয়ান্- সরকার ও হামাস-সরকার ইরানেরও কঠোর সমালোচনা করেছে এবং সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির অধিকারী বিভিন্ন মহল ব্যাপক অপপ্রচার চালাচ্ছে, যদিও তারা জানে যে, ইরান কেবল ফিলিস্তিনের স্বার্থে সিরিয়ার আসাদ- সরকারকে সমর্থন করছে।

বহির্বিশ্বে একটি ইসলামী সরকার হিসেবে পরিচিত তুরস্কের এর্‌দোগান- সরকারও সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ প্রশ্নে ইখওয়ান্ ও হামাসের অনুরূপ ভূমিকা পালন করছে।

সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ প্রশ্নে ইখওয়ান্, হামাস্ ও তুরস্ক- সরকারের এ ভূমিকার পিছনে নিহিত কারণ কোনো অস্পষ্ট বিষয় নয় এবং তারা তা গোপন করারও চেষ্টা করে নি। তা হচ্ছে, যেহেতু সিরিয়ার সংখ্যাগুরু জনগণ সুন্নি এবং, তাদের দৃষ্টিতে, আসাদ-সরকার শিয়া সেহেতু তারা বাশার্ আল্-আসাদের সরকারকে উৎখাতের লক্ষ্যে সূচিত বিদ্রোহকে সমর্থন দিচ্ছে, যদিও আসাদ- সরকার মুসলিম বিশ্বের আরো অনেক সরকারের ন্যায় একটি ধর্মসম্পর্করহিত (সেক্যুলার্) সরকার – যাদের ক্ষেত্রে ইসলাম বা শিয়া-সুন্নি পরিচিতি প্রাসঙ্গিক নয়। তাদের পক্ষ থেকে বিষয়টিকে এভাবে সঙ্কীর্ণ মায্‌হাবী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেমন দুর্ভাগ্যজনক, তার চেয়েও বেশী দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে ইসরাঈল- বিরোধী একটি সরকারের পতন ঘটানোর প্রচেষ্টায় সমর্থন জানানো – যা তাদের দ্বীনী দৃষ্টিভঙ্গির অগভীরতা ও রাজনৈতিক অদূরদর্শিতারই পরিচয় বহন করে। বলা বাহুল্য যে, আল্-ক্বায়েদাহ্ ও ত্বালেবান্ প্রমুখ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনসমূহ যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার পিছনেও একই সঙ্কীর্ণ মায্‌হাবী চেতনা কাজ করেছে – যা ইসলামের চির দুশমন পাশ্চাত্যের পক্ষ থেকে উস্কে দেয়া হয়েছে।

এখানে বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে, ফিলিস্তিনী মুসলমানগণ সুন্নি হওয়া সত্ত্বেও ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সম্ভব সব কিছুই করেছে এবং বস্তুগত ও অবস্তুগত প্রয়োজনীয় সব রকমের সহায়তা দিয়ে হামাসকে গড়ে উঠতে, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ও ইসরাঈল- বিরোধী সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে। তেমনি দক্ষিণ লেবাননের শিয়া মুসলমানদেরকে সর্বাত্মক সহায়তা দিয়ে হিয্‌বুল্লাহ্ সংগঠন ও তার যোদ্ধাদের গড়ে তুলেছে যারা নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে ফিলিস্তিনের মুক্তির লক্ষ্যে যায়ন্‌বাদী ইসরাঈলের বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এ কাজ করতে গিয়ে তারা এ চিন্তাকে মাথায় স্থান দেয় নি যে, ফিলিস্তিনের

মুসলিম জনগণ শিয়া নয়, সুন্নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, হামাস্ ও অন্য অনেকে ফিলিস্তিনেরই স্বার্থে সিরিয়ার আসাদ্- সরকারকে সমর্থন করার দায়ে সেই ইরান ও হিয্বুল্লাহ্র বিরুদ্ধে সমালোচনা করছে ও বিভ্রান্তিকর প্রচার চালাচ্ছে।

যারা আজ সিরিয়া প্রসঙ্গে শিয়া শাসক ও সুন্নি সংখ্যাগুরু জনগণের যুক্তি দেখাচ্ছ তারা কিন্তু বাহ্রাইনের ক্ষেত্রে বিপরীত আচরণ করছে; সেখানে শিয়া সংখ্যাগুরু জনগণের ওপর রাজতান্ত্রিক সুন্নি সরকারের শাসনের বিরোধিতা করছে না, বরং তাকে সমর্থন করছে। এর আগে এ ধরনের লোকেরা তথাকথিত সুন্নি শাসক সাদ্দামের (প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্র দুশমন নাস্তিক) দ্বারা শিয়া সংখ্যাগুরু জনগণকে শাসনের নামে তাদের ওপর নির্যাতনের স্টীম রোলার চালানো ও গণহত্যার আশ্রয় নেয়ার বিরোধিতা করে নি।

শিয়াদের বিরুদ্ধে হত্যাভিযান

সমকালীন বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ্র আরেকটি বড় ও বিপর্যয়কর সমস্যা হচ্ছে কতক সঙ্কীর্ণচিত্ত ধর্মীয় গোষ্ঠী কর্তৃক শিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কায়দায় হত্যাভিযান পরিচালনা। বিশেষ করে ইরাকে ও পাকিস্তানে শিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে এ ধরনের নৃশংসতা অব্যাহত রয়েছে। ইরাকে মূলতঃ মায্হাবী ও রাজনৈতিক কারণে এবং পাকিস্তানে স্রেফ মায্হাবী মতপার্থক্যের কারণে এ হত্যাভিযান চালানো হচ্ছে।

ইরাকের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ শিয়া মায্হাবের অনুসারী। ফলে স্বৈরাচারী সাদ্দামের পতনের পর স্বাভাবিকভাবেই শিয়া মায্হাবের অনুসারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এককভাবে দেশ শাসন করতে পারতো। কিন্তু সেখানকার শিয়া নেতৃবৃন্দ তা চান নি এবং করেন নি; তাঁরা সকলকে নিয়ে দেশ গড়ার কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং কেন্দ্রে শিয়া, আরব সুন্নি ও কুর্দী সুন্নিদের সমন্বয়ে সরকার গঠন করেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও সেখানে নিয়মিত শিয়াদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে, বিশেষ করে মসজিদে ও মাযারে হামলা চালানো হচ্ছে। এ সব হামলার মাধ্যমে একই সাথে রাজনৈতিক ও মায্হাবী দৃষ্টিকোণ থেকে শিয়া-বিদ্বেষ চরিতার্থ করা হচ্ছে।

পাকিস্তানে শিয়া মায্‌হাবের অনুসারীদের সংখ্যা আনুমানিক শতকরা ২৫ ভাগের মতো। কিন্তু সেখানে "সিপাহে ছ্বাহাবাহ্‌" নামক একটি চরমপন্থী সংগঠন শিয়াদের বিরুদ্ধে নিয়মিত হত্যাভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের দৃষ্টিতে শিয়ারা কাফের, তাই তাদেরকে হত্যা করতে হবে। অথচ শিয়া ও সুন্নি উভয়ের মৌলিক 'আক্বীদাহ্‌ সমূহ ও মৌলিক আমল সমূহ অভিন্ন।

তাওহীদ, আখেরাত্‌, খাত্‌মে নবুওয়াত্‌, কোরআন, ক্বিব্‌লাহ্‌, ফরয নামায, ফরয রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি সহ ফরয ও হারামের প্রায় সকল ব্যাপারে শিয়া ও সুন্নি অভিন্ন; কয়েকটি বিষয়ে শিয়া ও সুন্নির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এ ধরনের পার্থক্য সুন্নি ধারার বিভিন্ন মায্‌হাবের মধ্যেও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, খাদ্যের হালাল- হারামের ব্যাপারে শিয়া ও হানাফী মায্‌হাব্‌ খুবই কাছাকাছি, যদিও শিয়া মায্‌হাবের দৃষ্টিতে হারামের ক্ষেত্র অধিকতর প্রসারিত, অন্যদিকে মাালেকী মায্‌হাবের দৃষ্টিতে বেঙ ও কুকুর সহ প্রায় সকল প্রাণীই হালাল। এমতাবস্থায় কী করে কেউ শিয়াদেরকে কাফের গণ্য করতে পারে? শিয়া ও সুন্নির মধ্যে মূল পার্থক্য ইমামত ও খেলাফতের ধারণায় এবং এ বিষয়টি এমন যার ভিত্তিতে কাউকে কাফের গণ্য করার মতো কোনো অকাট্য দলীল নেই।

কোরআন মজীদে যেখানে কেবল শির্‌ক্‌ না করার শর্তে আহ্‌লে কিতাবের সাথে শান্তি ও সমঝোতার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে (সূরা আালে 'ইম্‌রাান্‌ ঃ ৬৪), অন্যদিকে ইসলাম এমনকি কাফের- মুশরিকদের বেলায়ও হত্যাপরাধের শাস্তি ও যুদ্ধরত শত্রুকে ব্যতীত কাউকে হত্যার অনুমতি দেয় নি। কাফের- মুশরিকদের মধ্য থেকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, কিন্তু তারা যুদ্ধ থেকে বিরত হলে যালেম ব্যতীত কারো ওপর চড়াও হতে নিষেধ করা হয়েছে (সূরা আল্‌-বাক্বারাহ্‌ ঃ ১৯০- ১৯৩)। এমতাবস্থায় কী করে তারা শিয়াদেরকে কাফের গণ্য করতে ও তাদেরকে হত্যা করা বৈধ গণ্য করতে পারে? এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, যারা তা করছে তারা সজ্ঞানে না হলেও অজ্ঞাতসারে ও অজ্ঞতাবশতঃ ইসলামের দুশমনদের হাতে ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এ ধরনের কুফরী ফত্‌ওয়া কেবল শিয়াদের বিরুদ্ধেই দেয়া হচ্ছে না, কতক গোষ্ঠী কেবল নিজেদেরকে ব্যতীত শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে অন্য সমস্ত মুসলমানের বিরুদ্ধেই

কুফরী ফত্ওয়া দিচ্ছে। আর এ ধরনের কতক গোষ্ঠী ইসলামের অতীত ইতিহাসেও ছিলো।

ইমাম মাহ্দীর (আ.) আবির্ভাব- পূর্ব যুগে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পথ

আমরা আমাদের এ আলোচনায় সর্বশেষ যে বিষয়টির ওপর সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই তা হচ্ছে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার সঠিক পন্থা।

যেহেতু প্রথম তিন খলীফাহ্ ও আহলে বাইতের (আ.) ইমামগণ আমাদের মাঝে শারীরিকভাবে উপস্থিত নেই সেহেতু তাঁদের শাসনকর্তৃত্ব মানা বা না মানার বিষয়টি বর্তমানে কার্যতঃ প্রাসঙ্গিক নয়, যদিও তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে এতদসংক্রান্ত বিতর্কের ফয়সালা ফায়দাহীন নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ অবস্থায় মুসলিম উম্মাহ্র শাসনকর্তৃত্বের ফয়সালা কীভাবে হবে। এ ব্যাপারে কোরআন মজীদ ও হাদীছের আলোকে যে দিকনির্দেশ পাওয়া যায় তার মূল মর্ম হচ্ছে, মুসলমানদের জন্য ইসলামী হুকুমত একটি অপরিহার্য বিষয় এবং এ ক্ষেত্রে শাসন- কর্তৃত্বের হকদার হলেন উপযুক্ত আলেমগণ – যা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত সূরা ইউনুস্-এর ৩৫ নং আয়াত থেকে যেমন প্রমাণিত হয় তেমনি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হাদীছ العلماء ورثة الانبياء. – "আলেমগণ নবী-রাসূলগণের উত্তরাধিকারী।" থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয়।

অবশ্য এখানে আলেম বলতে ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী (যিনি পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ থেকে যুগোপযোগী বিধান বের করতে পারেন) বুঝানো হয়েছে।[১] তেমনি কোনো আলেম কেবল নবীর 'ইল্মের অধিকারী হলেই নবীর উত্তরাধিকারী হতে পারেন না, বরং তাঁকে নতুন ওয়াহী প্রাপ্তি ব্যতিরেকে নবী-রাসূলগণের (আ.) অন্যান্য গুণাবলীরও অধিকারী হতে হবে – যে সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, তাঁকে চিন্তা, কথা ও কাজে তাক্বওয়া ও ভারসাম্যের অধিকারী হতে হবে অর্থাৎ তিনি চরমপন্থী (ইফ্রাাত্বী)ও হবেন না, শিথিলপন্থী (তাফ্রীত্বী)ও হবেন না, বরং তিনি হবেন ইসলামের প্রতিচ্ছবি (শুহাদাাআ 'আলাান্নাাস্) ও মধ্যমপন্থী (উম্মাতে

[১] একটি হাদীসে এসেছে: 'আলেমরা হলেন নবীগণের ওয়ারিশ ... প্রত্যেক প্রজন্মেই কিছু ন্যায় পরায়ণ আলেম রয়েছে, যারা অতিরঞ্জনকারীদের বিকৃতি, বাতিল পন্থীদের মিথ্যা পন্থা এবং মূর্খদের ব্যাখ্যাকে দীন থেকে বিদূরিত করে।'(উসুলে কাফী, ১ম খ-, পৃ. ৩৯, কিতাবু ফাদলিল ইলম, হাদীস নং ২)- এ হাদীস থেকে বোঝা যায় উদ্দিষ্ট আলেম এতটা পারদর্শিতার অধিকারী যে, ধর্মের (বিশ্বাসগত হোক বা বিধানগত বিষয়) মধ্যে সামান্য বিচ্যুতি ঘটলে অথবা কেউ ধর্মের অপব্যাখ্যা করলে তার চোখ এড়িয়ে যায় না। -সম্পাদক

ওয়াসাত্ব) । সেই সাথে তাঁকে স্থান- কাল ও পরিবেশ- পরিস্থিতির দাবীর প্রতি লক্ষ্য রেখে মুসলিম জনগণকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দানের জন্য যথাযথ দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি (বাছীরাত্)-এর অধিকারী হতে হবে ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাঁরা কীভাবে নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হবেন?

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অতীতে যে সব প্রচেষ্টা চলেছে এবং বর্তমানে যে সব প্রচেষ্টা চলছে সেগুলোকে মোট পাঁচ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে । এগুলো হচ্ছে ঃ

(১) ক্ষমতাসীন রাজা- বাদশাহ্‌র দ্বারা ইসলামী আইন- বিধান কার্যকর করার উদ্যোগ । এ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ মুসলিম জনগণকে সন্তুষ্ট করে ক্ষমতার ভিত্তি মযবূত্ করাই হয় লক্ষ্য । এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে যদি সংশ্লিষ্ট শাসকের নিয়্যত খালেছ্ও হয় তথাপি তিনি প্রকৃত ওয়ারেছে আম্বিয়া' না হওয়ায় তা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী হুকুমত হয় না । ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান না থাকায় তাঁর পক্ষে পরিপূর্ণ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারার প্রশ্নই ওঠে না । তিনি হয়তো কতক উপযুক্ত আলেমকে উপদেষ্টা নিয়োগ করতে পারেন । কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতা তাঁর হওয়ায় উপদেষ্টাগণ পরামর্শ দিতে গিয়ে তাঁর স্বার্থ ও সন্তুষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখবেন এটাই স্বাভাবিক ।

অন্যদিকে এ ধরনের রাজা- বাদশাহ্ ইসলামী হুকুমত বলতে মূলতঃ কেবল ইসলামী দ-বিধি কার্যকর করাকেই বুঝে থাকেন । এ ধরনের হুকুমতে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মেধা-প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশ অনুপস্থিত থাকে । তাছাড়া প্রতিষ্ঠিত রাজতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামো বহাল থাকায় অন্যায়- অত্যাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদের স্বাধীনতা থাকে না বা মুখে ও কাগজপত্রে থাকলেও লোকেরা ভয়ে তা কাজে লাগাতে সাহস পায় না । ফলে কিছুটা রেখেঢেকে হলেও সমস্ত রকমের অন্যায়- অনাচারই অব্যাহত থাকে । বিশেষতঃ স্বয়ং রাজা বা বাদশাহ্‌র ও তাঁর পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী ব্যক্তিদেরকে আইনতঃ না হলেও কার্যতঃ আইন ও বিচারের উর্ধে গণ্য করা হয় । এ ধরনের কথিত ইসলামী হুকুমতের প্রতিষ্ঠায় জনগণের ভূমিকা না থাকায় সঙ্কটকালে হুকুমত জনগণকে পাশে পায় না বিধায় তা টিকে থাকতে পারে না ।

(২) সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কোনো সেনাপতি বা সামরিক কাউন্সিল কর্তৃক ক্ষমতা দখল করার পর ইসলামী আইন- বিধান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। এ ধরনের উদ্যোগের অবস্থাও রাজা- বাদশাহ্‌র উদ্যোগের অনুরূপ।

(৩) ইসলামী রাজনৈতিক দলের দ্বারা ভোটের মাধ্যমে বা গণ- অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। এ ধরনের উদ্যোগের অনেকগুলো নেতিবাচক দিক রয়েছে, যেমন ঃ

(ক) এ ধরনের দল জনগণকে শুধু ইসলামের দিকেই আহ্বান করে না, বরং দলের দিকেও আহ্বান করে এবং যারা এতে সাড়া দেয় তাদেরকে সংগঠিত করে। আর যেহেতু সকলে এ আহ্বানে সাড়া দেয় না সেহেতু কার্যতঃ তারা জনগণকে বিভক্ত করে ফেলে এবং বিভিন্ন মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে এ ধরনের একাধিক দল গড়ে উঠতে পারে যার ফলে বিভক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, অথচ আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন (সূরা আালে 'ইম্‌রান্‌ ঃ ১০৩)।

(খ) দলের নেতৃত্ব সংশ্লিষ্ট দলের সকল বা কোনো না কোনো পর্যায়ের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে থাকেন, কিন্তু তারা যে দ্বীনী নেতৃত্বের জন্য পরিপূর্ণ শর্তাবলীর অধিকারী কোনো ব্যক্তিকে চিহ্নিত ও নির্বাচিত করতে সক্ষম হবে বা তাদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব আদৌ থাকবেই তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ফলে এ ধরনের নেতার পক্ষে দ্বীনের সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান ও দলকে সঠিক পথে পরিচালনা সম্ভব হবে তার কোনোই নিশ্চয়তা নেই।

(গ) দলীয় কাঠামোতে বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বের জন্য দ্বীনী যোগ্যতাসম্পন্ন লোক পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই শুধু তা-ই নয়, যেহেতু পদ খালি থাকে না, সেহেতু যাদেরকে সে সব পদে বসানো হয় তাদের ওপর স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এক ধরনের মিথ্যা দ্বীনী যোগ্যতা আরোপিত হয় – যার ফলে তাদের দ্বারা মানুষের বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ ঘটে।

(ঘ) দলীয় কাঠামোতে ইসলামের দুশমনদের পরিকল্পিত অনুপ্রবেশের সুযোগ থাকে। ফলে অনুপ্রবেশকারীরা দলকে বা দলের সরকারকে সহজেই তাদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে।

(ঙ) দলের লক্ষ্য ক্ষমতায় গিয়ে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা অর্থাৎ প্রথমে ক্ষমতায় যাওয়া ও পরে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা, ফলে লক্ষ্য হিসেবে ইসলামী হুকুমত দ্বিতীয় লক্ষ্যে পরিণত হয়ে যায়। তাই ক্ষমতায় যাবার পূর্বে ও পরে রাজনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ও রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে দলের পক্ষে দ্বীনী মানদ-পুরোপুরি বজায় রাখতে পারার নিশ্চয়তা থাকে না। বিশেষ করে দলের ও দলের লোকদের পক্ষে পুরোপুরি নিরপেক্ষ হওয়া – যা সুবিচার ('আদ্‌ল্)-এর দাবী – অসম্ভব। ফলে দলের ও তার সদস্যদের দোষকে চাপা দেয়া ও অন্যদের দোষকে বড় করে দেখা স্বাভাবিক – যা ইসলামী হুকুমতের সংজ্ঞা সম্বন্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে বাধ্য। এ ধরনের দলীয় হুকুমতে অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায় হলেও ধর্মসম্পর্কহীন (সেক্যুলার) হুকুমতের সকল বৈশিষ্ট্যই প্রবেশ করে। একটি ইসলামী সরকার হিসেবে পরিচিত তুরস্কের এর্‌দোগান সরকারের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক কালে দুর্নীতির ব্যাপক অভিযোগ ওঠা তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

দলীয় ইসলামী আন্দোলন বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে গড়ে ওঠা একটি নতুন দ্বীনী-রাজনৈতিক প্রক্রিয়া – বিগত প্রায় একশ' বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উপরোক্ত কারণসমূহের পরিণতিতে যা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে।

(৪) সশস্ত্র তৎপরতার মাধ্যমে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। এ সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি এবং দেখিয়েছি যে, ইসলামে এর বৈধতা নেই। অধিকন্তু এতে দলীয় প্রচেষ্টার সকল ত্রুটিই শামিল রয়েছে।

(৫) যুগজিজ্ঞাসার জবাব দানের যোগ্যতা সম্পন্ন দ্বীনী জ্ঞানের অধিকারী ওলামায়ে কেরাম তথা মুজ্‌তাহিদগণ কোনোরূপ রাজনৈতিক লক্ষ্য ছাড়াই মানুষের মাঝে সঠিক দ্বীনী শিক্ষা তুলে ধরবেন এবং তাদের মধ্যে উন্নত নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন। এর ফলে কখনো যদি সমাজের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হয়ে গড়ে ওঠে এবং তখনকার দূরদৃষ্টির অধিকারী উপযুক্ত ওলামায়ে কেরাম মনে করেন যে, সময়টি সমাজ ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ দ্বীনী জনগণের হাতে গ্রহণের জন্য উপযোগী তখন তাঁরা জনগণকে সাথে নিয়ে তা গ্রহণের উদ্যোগ নেবেন এবং তা কোন্ প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন করবেন তা তখনকার পরিস্থিতির আলোকে তাঁরাই নির্ধারণ করবেন। অতঃপর তাঁরা রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেলে তাঁদের মধ্যকার

উপযুক্ততম ব্যক্তিকে – যে সম্পর্কে তিনটি শর্তের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে – রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে বসাবেন।

এ প্রসঙ্গে সবশেষে একটি কথা উল্লেখ না করলে নয়। তা হচ্ছে, মুসলমানদের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য ব্যতীত কেবল দেশের স্বাধীন অস্তিত্বের হেফাযত ও জনকল্যাণের লক্ষ্যে চলমান রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ উচিত হবে কিনা? কারণ, ইসলাম ব্যক্তিকে তার জান, মাল, ইজ্জত্- সম্ভ্রম ও বৈধ পার্থিব স্বার্থ রক্ষার জন্য অনুমতি দেয়। বিষয়টি কেবল সমকালীন সামগ্রিক পরিস্থিতির আলোকে সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত দ্বীনী নেতৃত্বের দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে। কারণ, এ ধরনের অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে যদি দ্বীনী লক্ষ্য ও দ্বীনী চরিত্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই তা উৎসর্গ করতে হবে।

দর্শন

মানবতাবাদী চিন্তাধারার সমালোচনা

মানবতাবাদী চিন্তাধারার সমালোচনা

আবু যাহরা

চিন্তা ধারার সঙ্গে কর্মের অমিল

মানবতাবাদী মত একটি চিন্তাধারা ও তত্ত্ব হিসেবে যেভাবে বর্ণিত হয়ে থাকে তার সঙ্গে মানব সমাজে এর ঐতিহাসিক প্রয়োগ ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বাস্তবায়িত রূপের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ব্যবধান বৈপরীত্যে পর্যবসিত হয়েছে। মানবতাবাদ মানুষের সম্মানকে উচ্চকিত করার পরিবর্তে মানবতাকে বিসর্জন দিয়েছে। মানবতাবাদী চিন্তাধারার উৎপত্তি লগ্ন থেকেই বাঁচা ও জীবনের অধিকার, স্বাধীনতা ও মুক্তি, স্বাচ্ছল্য, সাফল্য ও আনন্দময় জীবনের নিশ্চয়তা মান ইত্যাদি মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল অথচ এ আন্দোলনের উৎপত্তির একশ বছর পরও যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথা আইন সম্মত ও বৈধ বলে গণ্য ছিল এবং মানব সমাজের একটি বড় অংশ দু'শ বছর মানবতাবাদের নামে ঔপনিবেশিক শোষনের শিকার হয়েছিল। এমনকি বিগত ও বর্তমান শতাব্দীতেও মানবতাবাদী চিন্তাধারার ধারক বাহক দেশগুলোর শাসন ক্ষমতায় নাৎসী, ফ্যাসীবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও বর্ণবাদী শাসকেরা অধিষ্ঠিত হয়েছে। মানবতাবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রী উভয়পন্থী শাসক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকেই মানবজাতি চরম নিষ্পেষণের শিকার হয়েছে এবং তাদের হাতে সহস্র কোটি মানুষ নিহত হয়েছে।

এ কারণেই অনেক মনীষীই মানবতাবাদকে বিভিন্ন ব্যঙ্গমূলক নামে অভিহিত করেছেন। যেমন: 'মানবতাবিরোধী আন্দোলন', 'প্রতারণামূলক মতবাদ', 'জাতি ও বর্ণভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে বিশ্বজনীন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলন', 'নাৎসীবাদ, ফ্যাসীবাদ ও নাস্তিবাদের জন্মদাতা, মানবতাবিরোধী চিন্তাধারার প্রশিক্ষক', ক্ষমতাশীলদের ক্ষমতার অপব্যবহারের যৌক্তিকতাদানকারী মতবাদ, ইত্যাদি।

কেউ কেউ বলেছেন: এমন কোন অপরাধের কথা চিন্তা করা যায় না যাকে মানবতাবাদী মতবাদের নাম বৈধতা দেয়া যায় না বা ঐতিহাসিকভাবে তা মানবতাবাদের নামে সম্পাদিত হয়নি।

মানবতাবাদের নেতিবাচক প্রভাব এতটা তীব্র হয়েছে যে কোন কোন মনীষী এ মতবাদকে মানবতার বন্দীশালা ও বন্দীত্বের মতবাদ বলেছেন এবং এর থেকে মুক্তির জন্য পরিকল্পনা ও কর্মসূচী তৈরীর কথা বলেছেন।

যুক্তিহীন চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত মতবাদ

মানবতাবাদের অন্যতম দুর্বলতা হল এর মৌলনীতির কোন চিন্তাগত ভিত্তি নেই। তারা কোনরূপ যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন ছাড়াই নিজেদের দাবিকে স্বতসিদ্ধ জ্ঞান করেছেন। গির্জার নীতিহীন শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে আবেগ আপ্লুত প্রতিক্রিয়া দেখানো, প্রাচীন গ্রীস ও রোমান চিন্তাধারার প্রতি অন্ধ আসক্তি এবং নেতৃত্বের খাহেশ তাদের নিছক আবেগ তাড়িত এক আন্দোলনের দিকে পরিচালিত করেছিল। তাই তারা সকল মানুষ যে জন্মগতভাবে এক দাবিটি উত্থাপন করেছেন কিন্তু এটা প্রমাণের জন্য কোন যুক্তি আনার প্রয়োজন মনে করেন নি। টমাস জেফারসন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণায় বলেন: আমরা এ বিষয়টি স্বতসিদ্ধ মনে করি যে, সকল মানুষ জন্মগতভাবে সমান।

টনি ডেভিস বলেছেন: রেনেসাঁর যুগের প্রভাব সৃষ্টিকারী ও উপহাসমূলক একটি গ্রন্থ বাইবেলে বর্ণিত অতি প্রাকৃতিক ও অধিবিদ্যাগত সকল তত্ত্বকে প্রশ্নবিদ্ধকারী উক্তি ও মন্তব্যে পূর্ণ ছিল। আর তাই এই গ্রন্থটি সভ্য সমাজকে তৎকালীন সময়ে মানবাধিকার বিষয়ে রচিত অপর একটি গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক ক্ষুব্ধ করেছিল। উল্লিখিত গ্রন্থটি ভল্টেয়ারের রম্য রচনার ধারা অনুসরণ করে রচিত হয়েছিল এবং এর রচয়িতা তাতে উপহাসের বিশেষ সাহিত্যিক বর্ণনা কৌশল ব্যবহার করেছিল।

কোন কোন মনীষী মানবতাবাদী চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে মানবতাবাদীদের স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যেই বাস্তবায়ন করা হয়েছিল বলে মনে করেন।

টনি ডেভিস মানবতাবাদীদের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত বিভিন্ন সার্বিক তত্ত্বগুলিকে মানবতাবাদীদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে উল্লেখ করে লিখেছেন: আমাদের সব সময় নিজেদের এ প্রশ্ন করতে হবে যে, মানবতাবাদের বিশ্বজনীন বিভিন্ন তত্ত্ব ও সার্বিক নীতিগুলির পেছনে কোন ব্যক্তিগত, আঞ্চলিক ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ কাজ করছে।

মানবতাবাদীরা প্রকৃত পক্ষে মানুষের মর্যাদাকে উচ্চকিত করা ও প্রচলিত চিন্তাধারাকে সংশোধিত করার উদ্দেশ্যে কাজ করেনি বরং ক্ষমতাশীল (রাজতান্ত্রিক) গোষ্ঠীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ধ্বংস করার সহজ পথ হিসেবে এ মতবাদের জন্ম দিয়েছিল।

লিওনার্ডো ব্রুনি বলেছেন: ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, মধ্যযুগীয় ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় কিভাবে সম্রাট ও শাসকদের প্রতি

সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং ক্ষমতাশীল শাসকদের শিক্ষা দেয় কিভাবে জাতি ও সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজেদের ক্ষমতাকে অধিক স্থায়ী ও দৃঢ় করা যায় ।

মানবতাবাদীরা এজন্য মধ্যযুগীয় প্রথা বিরোধী সকল কিছুকেই অভিনন্দন জানাতো এবং সমর্থন করতো । মধ্য যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল গির্জার শাসন, স্রষ্টা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য, মানুষের (আদমের) প্রথম গুনাহ ও সত্তাগত মন্দ প্রকৃতিতে বিশ্বাস, (সাধারণের মধ্যে ভারসাম্যহীন ও বাড়াবাড়িভাবে) আখেরি দিকের প্রতি মনোযোগ, সন্ন্যাসব্রত, পার্থিব ও দৈহিক চাহিদার প্রতি অনীহা, বুদ্ধিবৃত্তির অবমূল্যায়ণ । এ বিষয়গুলি মধ্যযুগে ইউরোপীয় সমাজকে আচ্ছন্ন করেছিল । এ কারণেই মানবতাবাদীরা গির্জার ক্ষমতা ও শাসন, ধর্মীয় বিশ্বাস ও খোদা কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ।

অন্যদিকে মানুষের সত্বাগত সৌন্দর্য, বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ মূল্যায়ণ, দৈহিক ও বস্তুগত চাহিদার প্রতি গুরুত্বদান, মানুষকে ঐশী আইন ও নীতি-নৈতিকতা থেকে মুক্তি দেয়ার ব্রত নিয়ে মাঠে নামে ।

তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিত: মধ্যযুগের গির্জা মানুষের যে সকল অধিকার হরণ করেছিল তা পুনরুদ্ধার করতে হবে ।

প্রশ্ন হল মানবতাবাদীরা কোন যুক্তি ও মানদ-ের ভিত্তিতে মানুষকে সকল কিছুর কেন্দ্র গণ্য করেছেন এবং স্রষ্টাসহ অতি প্রাকৃতিক সকল প্রকার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন? কোন প্রমাণের আলোকে নিরঙ্কুশ ও স্থায়ী কোন সত্তার বিদ্যমানতাকে অসম্ভব জ্ঞান করেছেন এবং মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত জীবনকে কাল্পনিক বলার প্রয়াস চালিয়েছেলেন?

অস্তিত্ব বিদ্যা (Ontology) ও পরিচিতি বিদ্যা (Epistemology) উভয় দৃষ্টিতেই মানুষের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার পক্ষে কোন যুক্তি নেই ।

খোদা, তার সৃষ্ট বিশ্বব্যবস্থা ও ঐশী প্রত্যাদেশকে অলীক বলে প্রমাণ করার জন্য কোন দলিলও তারা উত্থাপন করেনি । তারা মানুষের চিন্তা, ধারণা, কল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপর ভিত্তি করে যে নৈতিকতা আইন সৃষ্টি করেছেন বিনা যুক্তিতে সেগুলোকে মানবিক মূল্যবোধ বলে গণ্য করেছেন ।

কখনই এই ধরনের দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়কে কিছু সংখ্যক মানবতাবাদী দার্শনিকের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করে প্রমাণ অথবা প্রত্যাখ্যান করা যায় না । বরং দাবি করা যায় বুদ্ধি বৃত্তিক, ঐতিহাসিক, বর্ণনাগত ও অভিজ্ঞতা লব্ধ অসংখ্য প্রমাণ এ সকল দাবির বাপরীত বিষয়কে প্রমাণ করে ।

যদিও ইসলাম, ইহুদী ও খ্রিস্ট ধর্মের বিশ্বদৃষ্টিতে মানুষের বিশেষ ও মহান এক মর্যাদা রয়েছে। তাদের মতে সৃষ্টি জগত বিশেষত বস্তুগত, কামেল পুরুষের (পূর্ণ মানব) বরকতে এবং সার্বিকভাবে সকল মানুষের জন্য সৃষ্ট হয়েছে। পৃথিবী ও জড়জগতকে মানুষের পদানত ও অধীন করা হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টিগত ও বিধানগত পরিচালনার অধীনে রয়েছে এবং সম্পূর্ণরূপে তার প্রতি মুখাপেক্ষী। মহান আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া মানুষ অস্তিত্বগত (সত্তাগতভাবে) এবং বিধানগত পূর্ণতায় পৌছাতে সক্ষম নয়। একমাত্র মহান স্রষ্টা প্রদত্ত সামর্থ্য ও উপকরণ ব্যবহার করেই সে সৌভাগ্যবান হতে পারে। দাবিকৃত এ বিষয়গুলো ধর্মতত্ত্বের গ্রন্থসমূহে যুক্তির ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রকৃতিবাদিতা ও বস্তুবাদিতা

মানবতাবাদীদের অধিকাংশ দল (এমনকি বলা যায় প্রায় তাদের সকলেই) মানুষকে নিছক বস্তুগত (আত্মাহীন) এক অস্তিত্ব জ্ঞান করে। তারা মানুষকে প্রকৃতির অন্যান্য প্রাণীর মতই এক সত্তা বলে মনে করে। মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্য তাদের দৃষ্টিতে মানব সৃষ্ট বিভক্তি। আর তাই অস্তিত্বগত দৃষ্টিতে বাস্তবত এদের মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই। মানুষ সম্পর্কে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি একদিকে পাশ্চাত্য বিশ্বে উপযোগবাদ, ভোগবাদ ও বস্তুবাদিতার জন্ম দিয়েছে অন্যদিকে সকল প্রকার নৈতিক মূল্যবোধ, ঐশী আইন, আত্মিক মর্যাদা ও পূর্ণতা, আধ্যাত্মিকতা এবং চিরন্তন সৌভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

মানবতাবাদ ও ধর্ম

ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গিতে বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার শক্তি এক ঐশী দান। বিভিন্ন হাদীসে বুদ্ধি বৃত্তিকে নবীদের পাশাপাশি স্থান দিয়ে বলা হয়েছে নবীরা যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ঐশী বাহ্যিক দলিল তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিও তাঁর পক্ষ থেকে মানুষের অভ্যন্তরে নিহিত ঐশী দলিল। আর তাই ধর্মীয় দৃষ্টিতে মানবতাবাদের বিরোধিতা ও সমালোচনাকে কখনই বুদ্ধি বৃত্তির অবমূল্যায়ণ বলে গণ্য করা যায় না।

মূলত ইসলাম যে কারণে সমানবতাবাদের সমালোচনা করে তা হল বুদ্ধি বৃত্তিকে গুরুত্বদানের ক্ষেত্রে তাদের বাড়াবাড়ি এতটা বেশী যে, একে তারা খোদার আসনে বসিয়েছে। বরং বলা যায় তারা বুদ্ধিবৃত্তিকে খোদার ওপর প্রাধান্য দান করেছে। তারা বুদ্ধিবৃত্তিকতাকে খোদামুখিতা ও খোদাকেন্দ্রিকতার স্থলাভিষিক্ত করেছে। ধর্মীয় দৃষ্টিতে বুদ্ধিবৃত্তি মানুষকে খোদার দিকে পরিচালিত করে এবং খোদা পরিচিতি ও তাঁর আনুগত্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন: বুদ্ধিবৃত্তি হল তা-ই যার দ্বারা করুণাময়ের (আল্লাহর) ইবাদত করা হয় এবং বেহেশত অর্জিত হয়।

বিশিষ্ট সাহাবা ইবনে আব্বাস বলেছেন: বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারাই প্রতিপালককে চেনা ও তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন (তাঁর নৈকট্য লাভ) করা যায়।

বুদ্ধিবৃত্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করলেই কেবল মানুষ এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে, সে উদ্দেশ্যহীন এক সৃষ্টি নয় বরং সে মহান প্রতিপালকের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে রয়েছে।

আইন ও নৈতিক মূল্যবোধসমূহের মৌলনীতিগুলিকে যদিও খোদা প্রদত্ত বুদ্ধি বৃত্তি ও বিবেক দ্বারা চিহ্নিত ও শনাক্ত করা যায় কিন্তু বুদ্ধি বৃত্তির এ যোগ্যতা থেকে কখনই ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ ভিত্তিক মানবতাবাদ যে সঠিক তা প্রমাণ করা যায় না এবং এ দাবিও করা যায় না যে, প্রকৃত সফলতা কি তা নির্ণয় ও তাতে পৌঁছার পথ বুদ্ধিই নির্ধারণ করতে সক্ষম। বুদ্ধিবৃত্তি যে টুকু করতে পারে তা হল মানুষের চাহিদাসমূহ, ন্যায়বিচারের সঠিকতা ও তা পালনের প্রয়োজনীয়তা, মানবাধিকার, স্বাধীনতা ও মানুষের সুপ্ত যোগ্যতা ও উচ্চতর মূল্যবোধসমূহের বিকাশ ইত্যাদি বিষয়সমূহ সম্পর্কে সার্বিক ও অস্পষ্ট একটি ধারণা দিতে পারে। কিন্তু মানুষের প্রকৃত সৌভাগ্যে পৌঁছানোর পথ, পূর্বোল্লিখিত বিষয় গুলোর (যেমন ন্যায় ও অধিকারের) মানদ- ও সীমা, বিভিন্ন দিক, ক্ষেত্র বাস্তব দৃষ্টান্তগুলো চিহ্নিত করা বুদ্ধি বৃত্তির সামর্থ্য বহির্ভূত। সার্বিকভাবে সকল মানবতাবাদী এবং বিশেষভাবে অভিজ্ঞতাবাদী মানবতাবাদীরা এ সকল ক্ষেত্রে নিশ্চিত জ্ঞানের অভাবে বিভিন্ন মতবাদ ও ধর্মের ধারণা প্রসূত দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণযোগ্য ঘোষণা করে জ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈচিত্রকে স্বাভাবিক গণ্য করেছে।

ঐতিহাসিকভাবেও এ দর্শন ও বিজ্ঞান ভিত্তিকতার দাবিদাররা স্বাধীনতা ও সৌভাগ্য আনার পরিবর্তে বিপর্যয় ও ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে এনেছে। এরূপ পরিণতিকে আকস্মিক ও অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ঘটে যাওয়া একটি বিষয় বলা যায় না। মানুষকে যদি কোনরূপ ঐশী দিক নির্দেশনা ছাড়া নিজের প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলতে দেয়া হয় তবে তার ক্রোধ, আবেগ ও কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বাড়তে থাকবে।

অপ্রেম তাকে আচ্ছন্ন করে বুদ্ধি বৃত্তি ও বিবেককে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করবে। এমনকি নিজের মন্দ কর্মকে সঠিক বলে ব্যাখ্যা করার জন্য বুদ্ধি বৃত্তিকে ব্যবহার করবে। পবিত্র কোরআন বলছে: মানুষ যখন নিজেকে অমুখাপেক্ষী জ্ঞান করে তখন উদ্ধত হয়।

অবাধ ও বল্গাহীন স্বাধীনতা

মানবতাবাদীদের দৃষ্টিতে মানবিক মূল্যবোধকে সমর্থন দান, দার্শনিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ ব্যবস্থাসমূহ ও ধর্মীয় মৌলনীতি ও বিশ্বাসসমূহকে গ্রহণ এবং আদর্শিক ও বিমূর্ত ধারণার ভিত্তিতে মানবিক মূল্যবোধকে প্রমাণের চেষ্টা অগ্রহণযোগ্য।

মানুষকে স্বয়ং প্রকৃতি ও সমাজে স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে যাতে করে নতুন এক বিশ্ব গঠন এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে উন্নতি সাধন করতে পারে। বিদ্যমান অবস্থাকে নিজেদের কাঙ্ক্ষিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে উপযুক্ত যোগ্যতা এ স্বাধীনতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এ ধরনের অবাধ স্বাধীনতার নেতিবাচক প্রভাব মানবতাবাদীদের আচরণে প্রতিভাত হয়েছে এবং তা মানুষকে বিকশিত, তার অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং প্রকৃত প্রয়োজন পূরণের পরিবর্তে মানুষের প্রতি অবিচার, মানবাধিকারকে উপেক্ষা এবং প্রকৃত মূল্যবোধকে অস্বীকারে পর্যবসিত হয়েছে। বিগত শতাব্দীতে ফ্যাসীবাদ, নাৎসীবাদ মানবতাবাদের গর্ভ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে ।ওঐশী প্রত্যাদেশ ও ওহীর দিকে প্রত্যাবর্তন্ গ্রন্থের লেখক হার্ডি মানবতাবাদের এ পরিণতিকে "অবাস্তবায়িত লক্ষ্যসমূহের মর্মান্তিক ফল" বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন: (মানবিক) পূর্ণতার প্রতি ঝোঁক ও মনের আকর্ষণ এবং এক্ষেত্রে যে মানবতাবাদের পরাজয় ঘটবে এটা সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান এদুয়ের মধ্যে অনৈক্যের বিষয়টিকে উনবিংশ শতাব্দীর ট্রাজেডি বলে অভিহিত করা যায় এবং তা আধুনিকতাবাদের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।

মানুষের সত্তাগত ও মৌলিক একটি প্রবণতা হল আত্মপ্রেম। এ বিষয়টিতে আমরা একটু চিন্তা করলেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, যদি ধর্মীয় শিক্ষা এবং নৈতিক ও আইনগত মূল্যবোধের মাধ্যমে মানুষের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রীত না হয় তবে বুদ্ধি বৃত্তি ও বিবেক মানুষের পাশবিক প্রকৃতি ও আত্মপ্রেমের দ্বারা অবদমিত হয় এবং যে কোন প্রকার অপরাধে লিপ্ত হতে বাধ্য করে।

পবিত্র কোরআন এবং হাদীসসমূহেও এ বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, ওহী (ঐশী প্রত্যাদেশ) থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ নিজের ও অন্যদের জন্য অধঃপতনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। সে যেমন নিজেকে বঞ্চিত করে তেমনি অন্যদেরও চিরন্তন সৌভাগ্য থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং পার্থিব জীবনকে ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন করে। এ কারণে কোরআন যে মানুষ ঐশী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অধীনে না থাকে তাকে দুর্ভাগা ও ক্ষতিগ্রস্ত বলে মনে করে। মহান আল্লাহ বলেন: 'নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং পরস্পরকে ন্যায় এবং ধৈর্যের উপদেশ দেয়।' অন্যদিকে মানবতাবাদ যে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে তা মানুষের জন্য সকল প্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্যকে। স্বীকারে পর্যবসিত হয়েছে এবং সর্বসাধারণের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি তাতে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়েছে।

এ দৃষ্টি ভঙ্গিতে শুধু মানবাধিকারের কথা বলা হয় (তার দ্বায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা আদৌ উত্থাপন করা হয় না)। মানুষ কেবল তার অধিকার আদায় করবে, এর বিপরীতে তার কোন কর্তব্য পালন করতে হবে না। যদি তাকে কোন দায়িত্ব পালন করতেই হয় তবে তা হল তার স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই, এর অতিরিক্ত কিছু নয়।

মানবতাবাদের ধারণার স্বাধীনতা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে গণতন্ত্র এবং সামাজিক মূল্যবোধ ও আইনকে আপেক্ষিক একটি বিষয়ে পরিণত করেছে যার সঙ্গে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কোন সামঞ্জস্য নেই।

আমাদের ধর্মীয় দৃষ্টিতে সমগ্র সৃষ্টি তার অস্তিত্ব আল্লাহর থেকে লাভ করেছে, সকল মানুষ সমান, তারা সকলেই আল্লাহর নির্দেশের প্রতি দায়িত্বশীল, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌম ক্ষমতা এক আল্লাহর, তাঁর প্রেরিত নবিগণ, মনোনীত ইমাম ও প্রতিনিধি এবং তাদের স্থলাভিষিক্তরা তাঁর অনুমতিক্রমে শাসন ও কর্তৃত্বের অধীকারী হয়। নৈতিক ও আইনগত যে সকল মূল্যবোধ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয় এবং নবীরা বর্ণনা করেন তার মৌলনীতি (অর্থাৎ যার ভিত্তিতে তা প্রণীত হয়েছে) স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল। ধর্মীয় দৃষ্টিতে যদিও প্রত্যেক ব্যক্তির নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে এবং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেক সার্বিকভাবে তা অনুধাবন করতে পারে কিন্তু এ অধিকারের সীমা নির্ধারণ, প্রায়োগিক ক্ষেত্র নির্দিষ্টকরণ ও বাস্তবায়নের জন্য নীতিমালা আল্লাহই প্রণয়ন করবেন। আর এ ক্ষেত্রে প্রণীত আইনকে পালন করা প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর আরোপিত ঐশী এক দায়িত্ব। অন্যদিকে মানবতাবাদে মানুষের স্বাধীনতা এতটা অবাধ যে সে ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধসমূহকে উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু ইসলামসহ অন্যান্য ধর্মে মানুষের (ব্যক্তিগত ও সামাজিক) অধিকারগুলোকে রক্ষার পাশাপাশি ধর্মের কাছে পবিত্র বলে গণ্য বিশ্বাসসমূহের সম্মানও রক্ষা করা অপরিহার্য। উদাহরণ স্বরূপ মানবতাবাদের দৃষ্টিতে মানুষের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর তা ত্যাগ করে কুফর ও শিরক গ্রহণ করতে পারে এবং সকল অবস্থায় যে কোন ধর্ম গ্রহণের ও বর্জনের ক্ষেত্রে সে স্বাধীন। কিন্তু ইসলামে ইসলাম ধর্ম ত্যাগের বিষয়টি গুরুতর অপরাধ এবং জন্মসূত্রে মুসলমান ব্যক্তির জন্য এমন কর্মের শাস্তি মৃত্যুদ-।

তেমনি আল্লাহর রাসূল (সা.) এর প্রতি গালমন্দকারীর শাস্তিও মৃত্যুদ-। অথচ মানবতাবাদে এমন শাস্তির কোন গ্রহণ যোগ্যতা নেই। তাদের মতে কোন রাষ্ট্রোদ্রোহীর জন্য মৃত্যুদ-ের বিধান সমীচীন হলেও ধর্মত্যাগীর জন্য এমন মৃত্যুদ-ের বিধান বৈধ নয়।

উদারতা ও সহনশীলতা

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি মানবতাবাদীরা শর্তহীনভাবে উদারতা ও সহনশীলতার পক্ষপাতী। এটিকে তারা মধ্যযুগে বিদ্যমান সংস্কৃতির (মধ্যযুগে প্রচলিত প্রথা ও নীতিমালার) বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক বলে মনে করে। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সভ্যতার নিদর্শন হিসেবেই তারা এ উদারতা ও সহনশীলতাকে গ্রহণ করেছে যার মধ্যে তাদের ভাষায় মানবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তার স্বাধীনতার দাবি পূরণ হয়েছে। যারা সকল মূল্যবোধকে মানুষের সৃষ্টি ও তার হাতে গড়া বলে মনে করে তারা জ্ঞান ও পরিচিতি বিদ্যার ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতা ও সন্দেহবাদিতার জালে আবদ্ধ হয়েছে। এজন্য তারা বিশেষ কোন মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করাকে অপরিহার্য জ্ঞান করে না এবং তা রক্ষার জন্য পদক্ষেপ নেয়াকে অযৌক্তিক কর্ম বলে মনে করে। এ দৃষ্টিভঙ্গিটি সকল ঐশী ধর্ম বিশেষত ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে অসংগতিশীল বরং বলা যায় সম্পূর্ণ বিপরীত। উদারতা ও সহনশীলতার এ মৌলনীতিটি (জ্ঞান ও মূল্যবোধসমূহ মানবীয় ও আপেক্ষিক হওয়া) ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গির পরিপন্থী কারণ ধর্মীয় দৃষ্টিতে মূল্যবোধসমূহের স্রষ্টা মানুষ নয় বরং আল্লাহ। আর এ মূল্যবোধগুলো একদিকে শর্তহীন অন্যদিকে নিশ্চিত জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি নিস্পৃহতা যে কোন ধর্মের অনুসারীদের পক্ষ থেকেই অগ্রহণযোগ্য মনে করে এবং খোদা অস্বীকৃতি ও নাস্তিকতার সাথে কোনরূপ আপোস করে না।

অন্য সকল ঐশী ধর্মের (ইহুদী, খ্রিস্টান ইত্যাদি) অনুসারীদের সাথে ইসলাম নির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী কিন্তু ইসলামী সমাজে সকল ধর্মের পক্ষে অবাধ প্রচারনার অনুমতি ইসলাম দেয় না। অন্য ধর্মের অনুসারীরা ইসলামী রাষ্ট্রে প্রকাশ্যে ইসলাম বিরোধী কর্মে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি প্রাপ্ত নয়। অবশ্য ইসলাম তার প্রণীত কাঠামোর মধ্যে অন্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে সহাবস্থানের নীতি অনুসরণের ওপর গুরুত্বারোপই শুধু করে না বরং তাদের সাথে সদাচারণের কথা বলে। ইসলাম মুসলমানদের নির্দেশ দেয় যে, যদি কোন মানুষ সে যে কোন ধর্মের অনুসারীই হোক- নির্যাতন ও অন্যায়ের শিকার হয়ে সাহায্যের আহবান জানায় তখন প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব হল তার ডাকে সাড়া দেয়া ও তাকে অন্যায়কারীর হাত থেকে রক্ষা করা।

আপনার জিজ্ঞাসা

ইয়াজিদদের মুকাবিলায় ঐক্যই কারবালার শিক্ষা

ইয়াযীদদের মুকাবিলায় ঐক্যই কারবালার শিক্ষা

নিজেদের মধ্যে শত্রুতায় লিপ্ত হওয়ার আগে মুসলমানদেরকে শত্রুদের স্বরূপ চিনতে হবে। যারা মুসলমানদের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করছে তাদের ষড়যন্ত্র বুঝতে হবে। আর এক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে, নিজেদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করা। আমরা কেন শত্রুদেরকে প্রশ্রয় দেব এবং পরস্পরকে কাফের বলব? কেন পরস্পরের রক্ত ঝরানোকে বৈধ বলে মনে করব? এসব কখনই ঠিক নয়।

এসব কথা বলেছেন বাংলাদেশের ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষক আবুল কাসেম মোহাম্মাদ আনোয়ারুল কবির। শোকাবহ আশুরা উপলক্ষেরেডিও তেহরানকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে তিনি আরো বলে, আশুরা সম্পর্কে অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি বন্ধ করতে হবে। তাঁর পূর্ণ সাক্ষাৎকারটি এখানে উপস্থাপন করা হলো :

রেডিও তেহরান : জনাব আনোয়ারুল কবীর! কেন কারবালার মজলুম বীরগণ মানব জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছেন?

আবুল কাসেম মোহাম্মাদ আনোয়ারুল কবীর : আপনি প্রশ্নে দুটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। একটি হচ্ছে কারবালার মজলুম বীরগণ মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সম্মান এবং অমরত্ব লাভ করেছেন।

এখানে একদিকে সম্মান ও অন্যদিকে অমরত্ব লাভ– এ দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এ দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনার আগে আমি পৃথিবীতে যেকোন কাজের স্থায়িত্বের কারণ সম্পর্কে কিছু বলে নিতে চাই।

কোন কাজ যদি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয় তখন কাজটি পৃথিবীতে স্থায়িত্ব লাভ করে। পবিত্র কুরআনে সূরা আর রহমানে আল্লাহ তাআলা বলছেন, পৃথিবীর সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে কাজ করা হয়; সেটি স্থায়িত্ব লাভ করবে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কুরবানির বিষয়টিকে যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে দেখতে পাই, তিনি ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানির মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা

দেখিয়েছিলেন। এ কঠিন কাজটি তিনি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেছিলেন। আর সে কারণে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা এ ঘটনাটিকে মানবজাতির জন্য সুন্নাত বা তাদের জন্য পালনীয় একটি প্রথা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একইভাবে ইমাম হুসাইন (আ.)ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, তাঁর পবিত্র দ্বীনকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি অন্যায় ও বাতিলের প্রতিবাদ করার জন্য আন্দোলনে নেমেছিলেন। হযরত হুসাইন (আ.) তাঁর নানার ধর্মকে যখন ধ্বংসের মুখে যেতে দেখলেন, তখন নিজের জীবন দিয়ে হলেও সেই পবিত্র ধর্মকে রক্ষার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এটাই ছিল তাঁর বিপ্লবের উদ্দেশ্য।

আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন, হে রাসূল! আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর, তাহলে তোমরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে পারবে। আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল (সা.)-এর উম্মতের মধ্যে যারা যতটা রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য করবে তারা ততটাই আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে পারবে। আর যখন কেউ রাসূলে পাকের অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হবে তখন আল্লাহ তাঁর জন্য সব মানুষের মনে তাঁর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তাআলা সূরা মারইয়ামের ৯৭ নং আয়াতে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, যে কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সৎ কাজ করবে, তাঁর ওপর ঈমান আনবে, তার জন্য আল্লাহপাক মানুষের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। ইমাম হুসাইন (আ.)-এর আন্দোলনের মাধ্যমে অমরত্ব লাভের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। কারণ, মহান আল্লাহ যদি কোন কিছুকে স্থায়িত্ব না দেন, তাহলে মানুষের পক্ষে তাকে স্থায়িত্ব দেয়া সম্ভব নয়।

আমরা যদি অন্য দৃষ্টিতে অর্থাৎ সামাজিকভাবে বিষয়টিকে দেখি, তাহলে দেখব, মানুষের স্বাভাবিক একটি প্রবৃত্তি হচ্ছে জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া। মানুষ জুলুম ও অন্যায়কে পছন্দ করে না। আর এ বিষয়টি যেকোন ধর্মাবলম্বী ন্যায়পন্থী মানুষের প্রতি সমর্থন দানে মানুষকে উজ্জীবিত করে।

আমরা ইমাম হুসাইন (আ.)-এর আন্দোলনের মধ্যে লক্ষ্য করি, তিনি জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। শাসকগোষ্ঠীর কোন ধরনের ভ্রুকুটিকে তিনি মোটেই গুরুত্ব দেননি। আর এ কারণেই হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)-এর মধ্যে যে বিপ্লবী চেতনা ছিল সেটি আপামর মানুষের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করে। আমার দৃষ্টিতে

এটিই হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)-এর অমরত্ব লাভের পেছনে ভূমিকা পালন করেছে ।

পাশাপাশি আপনি যে সম্মানের কথা বলেছেন, সে সম্পর্কে আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনের সূরা তওবায় বলেছেন, 'সব সম্মান হচ্ছে আল্লাহর জন্য ।' একই সঙ্গে সূরা মুনাফিকুনে আল্লাহ বলেছেন, 'সম্মান হচ্ছে আল্লাহর, তাঁর রাসূলের এবং মুমিনদের ।' ইমাম হুসাইন (আ.) যেহেতু একজন মুমিন ছিলেন এবং আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশের প্রতি নিজেকে নিবেদিত রেখে নিষ্ঠাপূর্ণভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন, সে কারণে আল্লাহ যে সম্মানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটি হযরত হুসাইন (আ.) এবং তাঁর সঙ্গীরাও লাভ করেছিলেন। আমার দৃষ্টিতে মনে হয়, এ দুটি বিষয়ই ইমাম হুসাইন (আ.) এবং তাঁর সঙ্গীদের কর্মকে স্থায়িত্ব দিয়েছে। আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বের প্রতিটি জায়গায় তাঁদেরকে মানুষ স্মরণ করছে।

রেডিও তেহরান : কেন শহীদদের নেতা হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)-কে বিশ্বনবী (সা.) 'মুক্তির তরণী' তথা 'সাফিনাতুন নাজাত' বলে উল্লেখ করেছেন এবং কেন বলেছেন যে, 'হুসাইন আমা থেকে ও আমি হুসাইন থেকে'?

আবুল কাসেম মোহাম্মাদ আনোয়ারুল কবীর : হযরত নূহ (আ.)-এর জীবনের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, তাঁর তরণীটি ছিল মুক্তির তরণী। আর এ মুক্তির তরণীতে তারাই আরোহণ করতে পেরেছিল যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল। ইমাম হুসাইন (আ.)-কে রাসূল (সা.) মুক্তির তরণী বলেছেন বলে আপনি যে হাদিসের কথা উল্লেখ করেছেন, তার আগে একটি অংশ রয়েছে। সেটি হচ্ছে, ইমাম হুসাইন হচ্ছেন 'মিসবাহুল হুদা' বা 'হেদায়াতের প্রতীক' বা পথপ্রদর্শনের জন্য একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা– যেটি মানবজাতিকে পথের দিশা দেখাবে। আর এ কারণে 'মিসবাহুল হুদা' এবং 'সাফিনাতুন নাজাত'– এ দুটির মধ্যে একটি অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক রয়েছে। যে হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)-এর কাছ থেকে আলো গ্রহণ করবে সেই কেবল নাজাতের তরণীতে আরোহণ করার সুযোগ পাবে।

যখন ইমাম হুসাইন (আ.) বিপ্লব শুরু করেছিলেন আমরা যদি সেই সময়ের ইতিহাসের দিকে ফিরে যাই তাহলে দেখতে পাই, বিপ্লবের সময় এমন এক শাসক মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে বা খলিফা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল এবং নিজের আসনকে সব রকমের চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিল– রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উত্তরাধিকারি হওয়ার মতো কোন যোগ্যতা যার ছিল না। ইমাম

হুসাইন (আ.) কেবল রাসূলের নাতি হিসেবেই নন, বেহেশতের যুবকদের নেতা হিসেবেও তাঁর ওপর যে দায়িত্ব ছিল সেই দায়িত্ব পালনের জন্যই সেই শাসকের বিরুদ্ধে বিপ্লব করেন। রাসূলের উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁর ওপর দায়িত্ব ছিল, এমন অযোগ্য শাসক বা ব্যক্তিকে মুসলমানদের খলিফা হওয়া থেকে বিরত রাখা এবং এ বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর কাছে তুলে ধরা যে, কোন ফাসেক ব্যক্তি কখনই মুসলমানদের নেতা হতে পারে না। আর এজন্য হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) বারবার তাঁর বাণীতে উল্লেখ করেছেন, 'আমার মতো লোক কখনই ইয়াযীদের মতো লোকের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে পারে না।' তিনি বলেননি, 'আমি হুসাইন– ইয়াযীদের কাছে বাইআত করতে পারব না।'

বরং তিনি বলেছেন, 'আমার মতো লোক' অর্থাৎ যে কেউ ইমাম হুসাইনের মতো ন্যায়পন্থী হবে, সত্যের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হবে; সে কখনই ইয়াযীদের মতো পাপাচারী– যে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে, যে সব ধরনের অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় এবং নিজে তা সম্পাদন করার পাশাপাশি মানুষকে সেই অন্যায় কাজে প্ররোচিত করে– এ ধরনের ব্যক্তিকে কখনই মুসলিম উম্মাহর নেতা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না।

ইমাম হুসাইন (আ.) তাঁর প্রচেষ্টাতে সেদিন সফল হলেন; যার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখি, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে জালেম-ফাসেকদের বিরুদ্ধে যেসব বিদ্রোহ হয়েছে তার পেছনে ইমাম হুসাইনের আন্দোলনের চেতনা কাজ করেছে। আর এটাই হচ্ছে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর মুক্তির তরণী হওয়া।

রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যখন কোন জালেম শাসক তোমাদের ওপর চেপে বসে তখন যদি তোমরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করো তাহলে দেখা যাবে, সে তোমাদের ওপর এমনভাবে চেপে বসবে যে, সেই অবস্থা থেকে তোমরা কখনই মুক্তিলাভ করতে পারবে না।' আর এই পথটিই ইমাম হুসাইন (আ.) আমাদেরকে দেখিয়েছেন। আর এ কারণেই আল্লাহর কাছ থেকে রাসূল (সা.)-এর আনা ইসলাম ধর্মকে সঠিক রূপেই দেখতে পাচ্ছি আমরা।

একজন বিশিষ্ট গবেষক এ কারণে হযরত হুসাইন (আ.)-এর আন্দোলনকে চিত্রায়িত করেছেন এভাবে : 'মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে ইসলামের উৎপত্তি ঘটেছে এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ইমাম হুসাইন (আ.)-এর মাধ্যমে ইসলামকে আল্লাহপাক টিকিয়ে রেখেছেন। হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) সেদিন যদি আন্দোলনের আহ্বান না

জানাতেন এবং ইয়াযীদের মতো লোকের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়াতেন, তাহলে এরকম শাসকরা কিয়ামত পর্যন্ত ক্ষমতায় টিকে থাকত এবং নিজেদেরকে বৈধ হিসেবে মনে করত। আর কেউই তাদের বিরুদ্ধে কোনরকম প্রতিবাদ করার সাহস পেত না। ইমাম হুসাইন (আ.)-এর সমকালীন অনেক বিশিষ্ট সাহাবা ছিলেন (যেমন, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর), তারা কিন্তু বিষয়টিকে ইমাম হুসাইন যেভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সেভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। আর তাঁরা উপলব্ধি করতে না পারার কারণে কখনও ইমাম হুসাইন (আ.)-কে বলেছেন, 'আপনি এই কাজে যাবেন না। এ কাজে গেলে আপনাকে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে এবং আপনার পরিবার-পরিজনকে বন্দিত্ববরণ করতে হবে।' কিন্তু ইমাম হুসাইন (আ.) এসব কথার বা কোন কিছুর পরোয়া করেননি। কারণ, তিনি দেখেছেন, তিনি যদি আন্দোলন শুরু না করেন এবং এ সরকারকে বৈধতা দেন তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত জালেম সরকারগুলো বৈধতা পেয়ে যাবে। এ কারণে আমরা হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)-এর কাছে নিজেদেরকে ঋণী বলে মনে করি। তিনি যদি সেদিন আন্দোলন শুরু না করতেন তাহলে ইসলামকে আজ আমরা যে অটুট রূপে দেখতে পাচ্ছি সেটি পেতাম না। আর এটাকেই বলা যেতে পারে 'মুক্তির তরণী ইমাম হুসাইন (আ.)।

'হুসাইন আমা থেকে এবং আমি হুসাইন থেকে'– এ হাদিসটির ব্যাপারে আমার যে উপলব্ধি সেটি হচ্ছে, ইমাম হুসাইন (আ.)-এর আন্দোলনের মাধ্যমেই যেহেতু ইসলাম টিকে রয়েছে এবং রাসূল (সা.) যেহেতু ইসলামকে এনেছেন, সে কারণেই রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আমি হুসাইন থেকে।' রাসূলের কোন স্থানে থাকার অর্থ হচ্ছে ইসলাম টিকে থাকা। যদি ইসলাম টিকে না থাকে তাহলে রাসূল (সা.) টিকে থাকবেন না। ইসলামের টিকে থাকার সঙ্গে রাসূলের টিকে থাকার একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে।

আর এই সম্পর্কের প্রতি ইশারা করে রাসূল (সা.) বলেছেন, 'হুসাইন আমা থেকে' অর্থাৎ হুসাইনের সব বৈশিষ্ট্য আমার বৈশিষ্ট্যের মতো, আমার দ্বীনকে টিকিয়ে রাখার জন্য তার সব প্রচেষ্টা ছিল। আর এসব কারণে রাসূল (সা.) বলেছেন, 'হুসাইন আমা থেকে এবং আমি হুসাইন থেকে।'

পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে আল্লাহ পাক রাসূল (সা.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন : 'হে রাসূল! পৃথিবীর সব ব্যক্তি যদি আপনাকে ত্যাগ করে, তাহলেও আপনাকে আপনার দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ দিচ্ছি।' কিংবা বলা হয়েছে, 'হে রাসূল! আপনাকে যেভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেভাবে আপনি প্রতিরোধ করুন এবং দৃঢ়তা

প্রদর্শন করুন।' এই একই বৈশিষ্ট্য আমরা ইমাম হুসাইন (আ.)-এর মধ্যে দেখতে পাই। তাঁর প্রকৃত অনুসারী হিসেবে সর্বোচ্চ চেষ্টার মাধ্যমে তিনি তাঁর দায়িত্ব পৃথিবীতে পালন করেছেন। আর এ কারণে রাসূল (সা.) ইমাম হুসাইনকে নিজের অংশ বলে ঘোষণা করেছেন এবং বলেছেন, যদি হুসাইন থাকে, তাহলে আমিও টিকে থাকব। যদি হুসাইন থাকে তাহলে আল্লাহপাকের কাছ থেকে আমি যে ইসলাম এনেছি, যে ইসলামের জন্য আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি, সে ইসলাম টিকে থাকবে। ফলে ইসলাম টিকে থাকার পেছনে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর ঐতিহাসিক ভূমিকারই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ওই বক্তব্যের মাধ্যমে।

রেডিও তেহরান : জ্বী, আপনি শহীদদের নেতা ইমাম হুসাইন (আ.)-এর সম্মান ও মর্যাদার বিষয়টি তুলে ধরলেন। এ পর্যায়ে আমরা আপনার কাছে জানতে চাইব, মুহররমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দর্শন বা প্রধান শিক্ষাগুলো কী?

আবুল কাসেম মোহাম্মাদ আনোয়ারুল কবীর : মুহররমের দর্শন বা প্রধান শিক্ষাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রচুর সময় এবং ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন। বলা হয়ে থাকে, মুহররম এবং আশুরা নিজেই একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো। এর মধ্যে আমরা ইসলামের সব দিক প্রতিফলিত হতে দেখি। ইসলামের অস্তিত্বের জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন তার সবকিছুই আমরা সেদিন কারবালার প্রান্তরে চিত্রিত হতে দেখেছি। ইসলামের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ইমাম হুসাইন (আ.) যেমন নিজের জীবন দিয়েছেন, তেমনি তাঁর পরিবারের ১৮ সদস্য (ইমাম যায়নুল আবেদীন ওই ১৮ সদস্য সম্পর্কে বলেছেন, সমকালীন সময়ে তাঁদের মতো উত্তম মানুষের অস্তিত্ব পৃথিবীতে ছিল না। তাঁদেরকে ইমাম হুসাইন ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেছেন) শাহাদাতবরণ করেছেন। আর এটিই কারবালার সবচেয়ে বড় শিক্ষা। আমরা যখনই ইসলামের অস্তিত্বকে সংকটাপন্ন হতে দেখি তখনই তার প্রতিবাদ করা উচিত। শত্রুরা যত শক্তিশালীই হোক না কেন, তাদের সেই ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে নিজেদের দায়িত্ব সম্পাদন করাই হচ্ছে কারবালার মহান শিক্ষা, ইমাম হুসাইন (আ.)-এর শিক্ষা।

তাছাড়া জুলুম, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ করতে হবে, সেখানে সংখ্যার স্বল্পতার কোন অজুহাত দেখানোর যে সুযোগ নেই সেটা হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) কারবালায় দেখিয়েছেন। ৩০ হাজার সৈন্যর মোকাবিলায় মাত্র ৭২ জন সৈন্য নিয়ে তিনি জিহাদ করে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন কোনভাবে দায়িত্বে অবহেলা করার

সুযোগ নেই। আমাদের সংখ্যা কম বলে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে হাত গুটিয়ে নেব– এই শিক্ষা ইমাম হুসাইন (আ.) আমাদের দেননি।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আমার কাছে মনে হয়েছে সেটি হচ্ছে, হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) নিজেই তাঁর একটি বাণীতে উল্লেখ করেছেন, 'আমার নানার উম্মতের মধ্যে যে বিকৃতি এবং বিপথগামিতা সৃষ্টি হয়েছে সেই জায়গা থেকে তাদেরকে উদ্ধার করাকে আমি আমার দায়িত্ব বলে মনে করছি। আর দায়িত্ব পালনকে আমি আমার নানার মিশনকে সফল করার জন্য অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করি।' তিনি অন্য একটি স্থানে ইয়াযীদের কর্মকা-ের প্রতি ইঙ্গিত করে জনগণকে উদ্দেশ করে বলেছেন, 'আল্লাহর নির্দেশিত বৈধ বিষয়কে আমল করা হচ্ছে না। বিপরীতে হারাম বিষয়কে হালাল করা হচ্ছে। তাছাড়া ইসলামের ফরজ বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। অন্যদিকে বেদআত ও হারাম বিষয়গুলোকে ইসলামের নামে বৈধতা দেয়া হচ্ছে।' আর এরকম একটা পরিস্থিতিতে ইমাম হুসাইন (আ.) বসে থাকাকে সমীচীন মনে করেননি। এ কারণেই তিনি এ আদর্শ স্থাপন করে গেছেন যে, আমাদের সমাজে যখন কোন অন্যায়, অবিচার ও অনাচারের ঘটনা ঘটছে, হালাল জিনিসকে হারাম করা হচ্ছে এবং হারাম জিনিসকে হালাল করা হচ্ছে, অবৈধ নানা পথ সৃষ্টি করা হচ্ছে তখন চুপ করে বসে থাকার কোন সুযোগ নেই।

আর ইমাম হুসাইন (আ.)-এর সঙ্গীদের মধ্যে যে বিষয়টি লক্ষ্য করি সেটি হচ্ছে ইমাম হুসাইনের প্রতি তাঁদের পরম আনুগত্য। মাত্র ৭২ জন হওয়া সত্ত্বেও এবং শত্রুর সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখেও তাঁরা শত্রুদের বিরাট সৈন্যদলের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তাঁরা একবিন্দুও পিছপা হননি। ইমাম হুসাইনকে সাহায্য করা পরম দায়িত্ব মনে করে নিজেদের শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তা পালন করেছেন। আর এ বিষয়টির শিক্ষা হচ্ছে– আমাদের সমাজে যারা প্রকৃত নেতা তাদেরকে যেন ত্যাগ না করি। প্রকৃত নেতা সত্যের দিকে আমাদেরকে যে আহবান করেন তা যেন মেনে চলি। কে সেই নেতাকে মানলো এবং কে মানলো না সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়। আমরা যেন প্রকৃত নেতার সত্য আহ্বানকে মেনে নেই এবং তাঁর সঙ্গে থাকি।

ইমাম হুসাইন (আ.)-এর সঙ্গীসাথিদের মধ্যে অনেকের ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়টি লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে, তাঁরা শুধু কারবালায় ইমাম হুসাইন (আ.)-এর সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করেননি, তাঁরা যুদ্ধের ময়দানে সত্যের অবস্থান তুলে ধরে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখেছেন। শত্রুদের সামনে সত্য ও সঠিক পথ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং শত্রু যদি ইসলামের অনুসারী হয় তাহলে তাদেরকে বোঝাতে হবে এবং সত্যের

দিকে আহ্বান জানাতে হবে। তাদের ভুল ভাঙানোর চেষ্টা করতে হবে। আমরা দেখেছি, কারবালায় হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)-এর বক্তব্যে কেউ কেউ প্রভাবিত হয়েছিলেন, যদিও তাঁদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। তাঁরা হুসাইন (আ.)-এর বক্তব্যের পর তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। ফলে আমাদেরকে চরম সংকটের মধ্যেও শত্রুর সামনে ইসলামের প্রকৃত রূপ তুলে ধরতে হবে। তাদেরকে এটা বোঝাতে হবে, তারা যেটা করছে তা ভুল এবং এর মাধ্যমে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইমাম হুসাইন (আ.) সেদিন এ কাজটিই করেছিলেন। তিনি রাসূল (সা.)-এর পোশাক ও পাগড়ি পরে, তাঁর তরবারি হাতে নিয়ে শত্রুর সামনে গিয়েছেন এবং বারবার তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, 'কেন তোমরা আমাকে হত্যা করতে চাও? তোমরা কি জান না যে, আমি রাসূল (সা.)-এর নাতি– আমি হযরত ফাতেমা ও আলীর সন্তান? তোমরা কি হযরত আলীর অবদানের কথা জান না? রাসূল (সা.) আমার মাতা ও পিতার ব্যাপারে কী বলেছেন, তা কি তোমাদের জানা নেই? আমার ভাই ও আমার ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে, আমরা বেহেশতের যুবকদের সর্দার। এ ব্যাপারে কি তোমরা অবহিত নও?' আর এসব কথা তিনি এজন্যই বলেছিলেন যে, এর মাধ্যমে তারা হয়তো সম্বিত ফিরে পাবে এবং ইমাম হুসাইন (আ.)-কে হত্যা করা থেকে বিরত থেকে জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে।

এ ব্যাপারে আমাদেরও মহান দায়িত্ব রয়েছে। যখন আমরা ইসলামের চরম সংকটজনক অবস্থা দেখব তখন আমাদেরকে ইসলামের প্রকৃত এবং সঠিক রূপ শত্রুর সামনে তুলে ধরতে হবে। তাদের সামনে চূড়ান্ত দলিল উপস্থাপন করতে হবে। তাতে যদি তাদের মধ্য থেকে একজন বা দুজনও হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় সেটিও আমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তাদের জন্যও মঙ্গলজনক। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন হযরত আলীকে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন তখন তাঁকে বলেছিলেন : 'হে আলী! তুমি যদি তাদের মধ্য থেকে একজনকেও হেদায়াত করতে পার, তাহলে পৃথিবীর সব মানুষকে হেদায়াত করার সমান সওয়াব আল্লাহ পাক তোমাকে দান করবেন।' আর ইমাম হুসাইন (আ.) সেই চেষ্টাই করেছেন। মুহররম আমাদের সেই শিক্ষা দেয় যে, আমরা শুধু আমাদের হাত বা অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করব না, শুধু প্রতিবাদও যথেষ্ট নয়; বরং আমাদের যুক্তি, বুদ্ধি দিয়ে ইসলামের প্রকৃত ও সঠিক রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করব। আর এর মাধ্যমে তাদেরকে হেদায়াতের চেষ্টা করাই আমাদের দায়িত্ব। হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) আশুরা ও কারবালার প্রান্তরে আমাদের এটাই শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

রেডিও তেহরান : মুহররম সংক্রান্ত নানা বাড়াবাড়ি বা কুপ্রথা ও বিকৃত ইতিহাস প্রচারের আলোকে কারবালা বিপ্লবের প্রকৃত শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের উপায়গুলো কী কী? বিশেষ করে সর্বস্তরে কারবালার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও শহীদদের বক্তব্যগুলোকে তাজিয়া মিছিল, শোক-মিছিল, শোক-সভা ও মর্সিয়া বা শোকগাথার মাধ্যমে প্রকাশ করে তাঁদের পবিত্র স্মৃতিকে চাঙ্গা রেখে শোককে শক্তিতে পরিণত করার পথে কেন নানা বাধা বিরাজ করছে এবং এইসব বাধা দূর করার উপায় কী?

আবুল কাসেম মোহাম্মাদ আনোয়ারুল কবীর : বর্তমানে আমরা মুহররম সম্পর্কে সমাজে অনেক বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করছি। কুপ্রথা ও বিকৃত ইতিহাস প্রচারের ধারা আমরা লক্ষ্য করছি। এসব বিষয় কারবালা বিপ্লবের শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। বিশেষ করে, কারবালার ঘটনা এবং শহীদদের বক্তব্যগুলোকে শক্তিশালীভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আমরা বাধার মুখে পড়ছি। আমার কাছে মনে হয়, এক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। কারবালার প্রকৃত ইতিহাস আমরা সমাজের সামনে তুলে ধরতে পারিনি। 'বিষাদ সিন্ধু' নামের উপন্যাসকে কারবালার ইতিহাসের একমাত্র তথ্য-উপাত্ত হিসেবে মনে করছি আমাদের অনেকেই। আমরা মনে করছি, কারবালার প্রকৃত ইতিহাস যেন এই বইয়ের মধ্যে নিহিত। অথচ এটি নিছক একটি সাহিত্যকর্ম। এখানে কারবালার ইতিহাসের শতভাগের একভাগও নেই। অন্যভাবে বলা যায়, হয়তো এর একভাগ সত্য, বাকি ৯৯ ভাগই অসত্য। এ বিষয়টি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। কারবালার প্রকৃত ইতিহাস জাতির সামনে, সমাজের সামনে তুলে ধরতে হবে। যদি সেক্ষেত্রে আমরা দায়িত্ব পালন না করি তাহলে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

কারবালার ঘটনা সম্পর্কে বিভ্রান্তির ক্ষেত্রে কিছু বানোয়াট হাদিস কাজ করেছে বলে আমার ধারণা। এতে বলা হচ্ছে, আশুরার দিনে কেবল কারবালার ঘটনাই ঘটেনি, পাশাপাশি আরো কিছু ঘটনা ঘটেছে। বলা হচ্ছে, এই দিনই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে। এ দিন হযরত ইবরাহীম (আ.) আগুন থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন, লওহে মাহফুজ সৃষ্টি হয়েছিল কিংবা হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকা এ দিন মুক্তি পেয়েছিল ।এ হাদিসগুলোকে আমাদের যাচাই করে দেখা উচিত। আমরা যদি দেখি সিহাহ-সিত্তা হিসেবে পরিচিত হাদিসগ্রন্থগুলোতে এসব হাদিস নেই, তাহলে প্রশ্ন উঠবে, তবে কেন এ হাদিসগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন আমরা সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা দিয়ে হাদিসগুলো নিয়ে ভাবি, তখন এদের মধ্যে নানারকম সাংঘর্ষিক বিষয় দেখতে পাই।

ফলে হাদিসগুলো সম্পর্কে আমাদের ব্যাপক গবেষণা করা উচিত। ওইদিন বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে বলে যে কথা বলা হচ্ছে তা যদি আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক কোন মানুষের সামনে তুলে ধরা হয় তাহলে তিনি হাসবেন।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমাদেরকে দেখতে হবে তা হচ্ছে, আশুরার দিন যে ঘটনাগুলোর কথা বলা হচ্ছে বর্তমানে সেগুলো ইসলামকে কতটা উদ্দীপনা যোগাচ্ছে। আমরা যদি ধরেও নেই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) আগুন থেকে মুক্তি পেয়েছেন বা বনি ইসরাইল মুক্তি পেয়েছে, তারপরও তা আমাদের বর্তমান বাস্তবতায় কতটা ভূমিকা রাখতে পারে? এসব ঘটনা আমাদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ যেখানে কারবালার মতো মর্মস্পর্শী ঘটনা ঘটেছে– যার কথা রাসূলুল্লাহ (সা.) ইমাম হুসাইনের জন্মের সময় হযরত ফাতেমা (সা. আ.)-কে বলেছিলেন। ইমাম হুসাইনকে হযরত ফাতেমার কোলে তুলে দেয়ার সময় রাসূল (সা.) বলেছিলেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে কেউ তাকে হত্যা করবে।' তিনি ইমাম হুসাইন (আ.)-কে 'বেহেশতের সর্দার' বলে গেছেন। ফলে তাঁর শহীদ হওয়ার পাশাপাশি ইসলামকে রক্ষার জন্য তিনি যে ভূমিকা পালন করেছেন তার গুরুত্ব কত? সেদিন তিনি যদি জীবন দিয়ে ইসলামকে রক্ষা না করতেন তাহলে ইসলাম আজ হুমকির মুখে পড়ত। ইসলামকে সেদিন তিনি আমাদের সামনে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। ফলে এই ঘটনাটিই তো আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি স্মরণীয় হয়ে থাকার কথা। অন্য যেসব ঘটনার কথা বলা হচ্ছে আমাদের জীবনে সেগুলোর কোন ভূমিকা নেই ।

যদি আমরা আল্লাহর ওপর নির্ভর করি এবং তাঁর সাহায্য চাই তাহলে তিনি আগুন থেকে উদ্ধার করতে পারেন, ফিরআউনের মতো ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। তবে শুধু ঐশী সাহায্যই যথেষ্ট নয়। অনেক ক্ষেত্রে আমাদেরকেও ভূমিকা পালন করতে হবে। পবিত্র কুরআনে আমরা পড়েছি, আল্লাহর দ্বীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহর শত শত নবী শহীদ হয়েছেন। এই পথটিই আমাদের করণীয় নির্ধারণ করে দেয়। আমাদেরকে এজন্য বসে থাকলে চলবে না যে ,আমাদের কাছে ঐশী সাহায্য আসবে। ইমাম হুসাইন (আ.) সেদিন কারবালায় শহীদ হওয়ার মাধ্যমে কি আমাদের হৃদয় থেকে মুছে গেছেন? নাকি এর বিপরীতে ইয়াযীদ আমাদের কাছে কুলাঙ্গার এবং অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে? আমরা আমাদের সন্তানদের নাম ইয়াযীদ রাখি না, অথচ আমরা আমাদের সন্তানদের নাম রাখি হুসাইন। আর এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইমাম হুসাইন (আ.) সেদিন নিজেকে উৎসর্গ করে তাঁর প্রতি আল্লাহর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে আমাদের জন্য

এমন নিদর্শন রেখে গেছেন যা আমাদের অনুসরণ করা উচিত। সুতরাং আশুরার দিনে আরও কী কী ঘটেছে তা থেকে সরে এসে কারবালার বিষয়টির প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত ।

শোককে শক্তিতে পরিণত করার উপায় হিসেবে আমি বলব, কারবালার প্রকৃত ইতিহাসকে তুলে ধরতে হবে। পাশাপাশি হযরত ইউসুফ (আ.)-কে জাগ্রত রাখার জন্য বা তাঁর স্মরণকে স্থায়ী রাখার জন্য হযরত ইয়াকুব (আ.) যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন সে পদ্ধতিও আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

যদি আমরা কেবল বলি 'ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাই না'– এ বিষয়টি কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। এটি নবীদের নীতির পরিপন্থী। হযরত ইয়াকুব (আ.) এক সময় নিজ সন্তান হযরত ইউসুফ (আ.)-কে হারিয়ে ফেলেছিলেন। যদিও তিনি জানতেন, ইউসুফ জীবিত রয়েছেন, তারপরও ৪০ বছর ধরে সন্তানের জন্য কেঁদেছেন। তাঁর এ ক্রন্দনের বিষয়টি মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ এটিকে সমালোচনা না করে বরং প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছেন। এটি এ কারণে হয়েছে যে, আল্লাহর কোন ওলি, কোন নবী বা তাঁর কোন প্রিয় বান্দা যদি আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে যান, তাঁকে যদি নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় সেক্ষেত্রে তাঁকে স্মরণ করা, তাঁর স্মৃতি জাগ্রত রাখা আমাদের দায়িত্ব। এটা আমাদের নবীদের শিক্ষা। হযরত হুসাইন (আ.)-এর জন্মের পর তাঁকে কোলে নিয়ে রাসূল (সা.) ক্রন্দন করেছেন এবং তাঁর সাহাবীদের সামনে ভবিষ্যতের শোকাবহ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সে সময় সাহাবীরাও কান্নাকাটি করেছেন। এখানেও কিন্তু ক্রন্দন, মর্সিয়া, শোকগাথার বিষয়টি আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে। আর এটি আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা প্রায় হারিয়ে গেছে বলা চলে। এ বিষয়গুলোকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে এবং আশুরার সংস্কৃতিকে শ্রোতা-পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

রেডিও তেহরান : মুহররমের শিক্ষাগুলো কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় বিশেষ করে কারবালার মহান বিপ্লবের আলোকে ইসলামী চিন্তাবিদদের ও শিক্ষিত মুসলিম সমাজের দায়িত্ব কী?

আবুল কাসেম মোহাম্মাদ আনোয়ারুল কবির : এ বিষয়ে আমি শুধু ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের নমুনাই আপনাদের কাছে তুলে ধরব। ইমাম খোমেইনী (র.) কারবালার

চেতনাকে কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন? কারবালার চেতনাকে কাজে লাগিয়েই তিনি ইরানে ইসলামী বিপ্লব করতে পেরেছেন।

কারবালার চেতনাকে তিনি গোটা ইরানি জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে, মুহররমের চেতনার অন্তর্নিহিত শক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন এবং এদেশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তিনি ইরানে ইসলামী বিপ্লব সফল করেছিলেন। এখন ইরানের ইসলামী বিপ্লব ৩৫ বছর অতিক্রম করেছে। ইসলামের প্রতি নিবেদিত থাকার কারণে আজ পর্যন্ত সেই বিপ্লব টিকে রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ এবং পৃথিবীর অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আপোষহীন থেকেও ইরান তার অস্তিত্বকে শুধু টিকিয়েই রাখেনি; বরং অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর মুহররমের শিক্ষার মাধ্যমেই ইমাম খোমেইনী (র.) এটি অর্জন করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, আমরা মুহররম ও সফর মাস থেকেই এ শিক্ষা নিয়েছি এবং আমাদের সব অর্জন এই দুই মাসের চেতনা ও শিক্ষার কাছে ঋণী ।

আর এই মুহররম ও সফর মাসের বিষয়টি আশুরা এবং কারবালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ইরানের জনগণের মধ্যে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর প্রতি যে ভালোবাসা রয়েছে সেই ভালোবাসাকে তিনি সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে পেরেছিলেন। ইমাম হুসাইন যেমন ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিপ্লব এবং যুদ্ধ করেছেন, একইভাবে ইমাম খোমেইনীও তৎকালীন সময়ের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এবং তাঁর দেশের মধ্যে সেই সাম্রাজ্যবাদীদের দোসর, শাহ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বিপ্লব করে তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে ইসলামী বিপ্লবের পতাকা উড়িয়েছেন। সারা বিশ্বের মুসলিম চিন্তাবিদগণ তো ইমাম খোমেইনীর এই শিক্ষা থেকেও লাভবান হতে পারেন। তারাও এই শিক্ষা থেকে নিজেদের জীবনকে উজ্জীবিত করতে পারেন।

ইমাম হুসাইন (আ.)-এর প্রতি আমাদেরও তো ভালোবাসা আছে। পৃথিবীর প্রতিটি মুসলমানেরই ইমাম হুসাইনের প্রতি গভীর ভালোবাসা আছে। ইসলামী চিন্তাবিদরা সেই শিক্ষার আলোকে একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঠিক করে নিতে পারেন যে, কিভাবে তাঁরা তাঁদের জীবনে মুহররমের শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করবেন যাতে অন্যের কাছে নতজানু হয়ে থাকতে না হয়।

বর্তমান বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে আমরা লক্ষ্য করি, বেশিরভাগ দেশই আমেরিকা কিংবা পরাশক্তির কাছে আত্মসমর্পন করে আছে। তাদের মধ্যে সেই বিপ্লবী চেতনা নেই যা সেদিন ইমাম হুসাইন (আ.) কারবালার মাধ্যমে

আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা আজ সেই শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছি। ইমাম খোমেইনী (র.) সেই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়েছিলেন। ইমাম খোমেইনী তাঁর জাতির প্রতিটি সদস্যের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, ইমাম হুসাইন ইয়াযীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, প্রতিটি যুগেই ইয়াযীদ রয়েছে। আর সেইসব ইয়াযীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। বিশ্বের প্রতিটি সমাজে, প্রতিটি জাতির মধ্যেই ইয়াযীদের মতো লোকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আর এসব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া মুসলমানদের দায়িত্ব। আর এ বিষয়টি ইসলামী চিন্তাবিদদের ভেবে দেখতে হবে। ইরানের ইসলামী বিপ্লব থেকে আমরা সেই শিক্ষা নিতে পারি। মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে যেসব ইসলামী আন্দোলন হচ্ছে, সেখানে কিন্তু এই চেতনার অভাব আমরা লক্ষ্য করি। এই চেতনার অভাবেই তারা লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হচ্ছেন। তাঁরা একদিকে জনগণকে বলছেন, 'আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চাই', অথচ আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে যে স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'তোমরা জালেমদের দিকে ঝুঁকে পড়ো না'– আল্লাহর সেই নির্দেশকে তাঁরা মেনে চলছেন না। তাঁরা একদিকে ইসরাইল ও আমেরিকার সঙ্গে সমঝোতা করে চলার নীতি গ্রহণ করছেন অন্যদিকে নিজ দেশের জনগণকে নিয়ে তাঁদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে চলতে চান।

আমাদের ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুসলিম সমাজকে বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। যখন আমরা কারবালার কথা বলব, যখন আমরা ইমাম হুসাইনের কথা বলব, তখন সব ইসলামী আন্দোলনের নেতাকর্মীর দায়িত্ব হচ্ছে, কল্যাণ চিন্তার নামে ইসলামের শত্রুর সঙ্গে আপোস করা যাবে না। ইসলামের শত্রুর সঙ্গে সন্ধি বা কোয়ালিশন– এ দুটিকে কখনই একচোখে দেখা ঠিক নয় ।

অনেকে কোয়ালিশন এবং সন্ধির মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন না। সন্ধি হচ্ছে দুটি পক্ষের মধ্যে আপাতত যুদ্ধবিরতির একটি উদ্যোগ। কিন্তু কোয়ালিশন ভিন্ন বিষয়। যে ইসলামের শত্রু তার সঙ্গে মিলেমিশে কখনই কাজ করা সম্ভব নয়।

হুদাইবিয়ার যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) যে সন্ধি করেছিলেন সেখানে তিনি কিন্তু কাফেরদের সঙ্গে সমঝোতায় যাননি এবং একথা বলেননি যে, 'আজ থেকে আমরা একসঙ্গে কাজ করব'; বরং সেখানে একটি সিসফায়ার (যুদ্ধবিরতি) হয়েছিল যে, 'আমরাও আপনাদের আক্রমণ করব না এবং আপনারাও আমাদেরকে আক্রমণ করবেন না।' পাশ্চাত্যের সঙ্গে যদি কোন সন্ধি করতে হয় তাহলে এ ধরনের শর্তে করা উচিত। কিন্তু এভাবে নয় যে, আমরা তাদের সব কথা মেনে নেব। আমরাও

তাদের কিছু কথা মেনে নেব, তারাও আমাদের কিছু কথা মেনে নেবে- এ ধরনের কিছু করার অবকাশ ইসলাম রাখেনি ।

রাসূল (সা.)-কে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, আপনি কাফেরদেরকে বলে দিন– তোমরা তোমাদের দ্বীন নিয়ে থাক এবং আমরা আমাদের দ্বীন নিয়ে থাকব। এখানে কাফেরদের সমালোচনা করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহকে অস্বীকারকারী। ফলে এখানে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে যে, আমাদের ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের মাথা ঘামানোর কোন সুযোগ নেই। আমাদের ইসলামী চিন্তাবিদদের এসব বিষয় ভেবে দেখা উচিত এবং এ থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত। মুসলিম সমাজের দায়িত্ব ইমাম হুসাইন (আ.)-এর আন্দোলন নিয়ে গবেষণা করা এবং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বর্তমান সমাজে কাজে লাগানো।

রেডিও তেহরান : প্রতিটি দিনই আশুরা ও প্রতিটি ময়দানই কারবালা। বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতি ও বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী জাগরণের আলোকে এই নীতিবাক্যের গুরুত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য বা পরামর্শ কী?

আবুল কাসেম মোহাম্মাদ আনোয়ারুল কবীর : প্রতিটি দিনই আশুরা এবং প্রতিটি ভূমিই কারবালা– এ হাদিসটির অনেকগুলো অর্থ হতে পারে। তার মধ্যে আমি যে অর্থটির কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে, সারা পৃথিবীর যেখানেই অবস্থান করি না কেন এবং যে সময়ই হোক না কেন, কারবালা এবং আশুরার গুরুত্ব রয়েছে। আশুরার দিন সংঘটিত দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টার যুদ্ধ এখানে প্রধান বিষয় নয়। আসলে ওই সময়টিতে সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বেরই একটা চিত্র ফুটে উঠেছে। কারবালার ঘটনা এমন কোন বিষয় নয় যে, ১৪০০ বছর আগে হয়েছে– ভবিষ্যতে এর কোন প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া নেই। পৃথিবীর যেখানে এবং যে সময়ে আমরা অবস্থান করি না কেন, কারবালার ঘটনার গুরুত্ব আমাদের কাছে রয়েছে। আর আশুরার দিনটিকে নিয়ে অবশ্যই আমাদেরকে স্থান ও সময়ের গ- পেরিয়ে চিন্তা করতে হবে। সৃষ্টির প্রথম থেকেই হযরত আদম (আ.) ও শয়তানের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে সেটি অব্যাহত থাকবে এবং ইমাম মাহদী (আ.)-এর চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে তার পরিসমাপ্তি ঘটবে।

সত্য ও মিথ্যার মধ্যে এই যে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব, তারই একটি চিত্র আমরা লক্ষ্য করি কারবালার ঘটনার মধ্যে। রাসূল (সা.)-এর সময় বা তার আগে কারবালার মতো নিষ্ঠুর ঘটনা দেখা যায় না ।

আশুরার পর থেকে আজ পর্যন্ত এবং ভবিষ্যতেও এরকম হৃদয়বিদারক কোন ঘটনা হয়তো আমরা দেখব না। তবে সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব কিন্তু আজও অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে আমি বলব, ইয়াযীদ শুধু একটি বংশ, গোত্র বা সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রতিটি যুগে এবং প্রতিটি সমাজে ইয়াযীদ রয়েছে; প্রতিটি যুগেই রয়েছে ফিরাউন এবং নমরুদের উপস্থিতি। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব, বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম দেশে কোন না কোন অশান্তি ও অস্থিরতা বিরাজ করছে। এগুলো আসলে কারা করছে? এগুলো ইসলামের শত্রুরাই করছে। আর এক্ষেত্রে ইসলামী দেশগুলোর জনগণের দায়িত্ব রয়েছে ।

রেডিও তেহরান : সবশেষে আপনার কাছে জানতে চাইব, বর্তমান যুগের ইয়াযীদদের সম্পর্কে আমাদের করণীয় কী?

আবুল কাসেম মোহাম্মাদ আনোয়ারুল কবীর : বর্তমান বিশ্বে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও অস্থিশীলতা সৃষ্টিকারীরা হচ্ছে ইয়াযীদেরই প্রেতাত্মা। তারা ইয়াযীদের প্রতিনিধি হিসেবে আজ সারাবিশ্বে অন্যায় ও অবিচার চালাচ্ছে। নব্য ইয়াযীদদের বিরুদ্ধে মুসলিম দেশগুলোর জনগণের কি কোন দায়িত্ব নেই? তারা কি চুপ করে বসে থাকবে? মুসলিম চিন্তাবিদ এবং শিক্ষিত সমাজের এক্ষেত্রে দায়িত্ব রয়েছে তাঁদের জাতি ও সমাজকে সচেতন করা। তাদের সামনে এ যুগের ইয়াযীদদের পরিচয় তুলে ধরতে হবে। আজকের ইয়াযীদ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো। আর এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিটি মুসলিম জাতিকে সচেতন করার দায়িত্ব ইসলামী চিন্তাবিদদের। শুধু ইসলামের বিধি-বিধান– নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত এবং ব্যক্তিগত আহকাম পালন করার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেললেই তো দায়িত্ব পালন হয়ে গেল না। আজ কারা মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছে, কারা আজ শিয়া-সুন্নির মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগাচ্ছে? পাকিস্তান, ইরাক ও আফগানিস্তানে বর্তমানে কি ঘটছে? এসব দেশে শিয়া ও সুন্নি মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করে দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়েছে ।

আবার আহলে সুন্নাতের অনুসারীদের নিজেদের মধ্যেও একই রকম অবস্থা দেখতে পাচ্ছি। যেমন তুরস্কে কুর্দি এবং তুর্কীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এগুলো মুসলমানদের শত্রুদের পরিকল্পনায় তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হচ্ছে। ফলে নিজেদের মধ্যে শত্রুতায় লিপ্ত হওয়ার আগে আমাদের শত্রুদেরকে চিনতে হবে যারা আমাদের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করছে। আর এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম দায়িত্ব

হচ্ছে, মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করা। আমরা কেন শত্রুদেরকে প্রশ্রয় দেব এবং পরস্পরকে কাফের বলব? কেন পরস্পরের রক্ত ঝরানোকে বৈধ বলে মনে করব? এসব তো কখনই ঠিক নয়। আমাদের কাজ হচ্ছে শত্রুদের পরিকল্পনাগুলো চিহ্নিত করা। তারপর সেসব পরিকল্পনা কিভাবে এবং কাদের মাধ্যমে আমাদের ওপর ব্যবহার হচ্ছে সেটিও খুঁজে বের করতে হবে। আর এসব বিষয় শনাক্ত করে তার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর যদি আমরা এটা করতে ব্যর্থ হই তাহলে আমাদের সামনে অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণতি নেমে আসবে। এজন্য আমাদের মুসলিম চিন্তাবিদ, গবেষক, আলেম ,শিক্ষিত সমাজ বিশেষ করে যাঁরা মিডিয়ার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন তাঁদের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। আর এ বিষয়ে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই আশুরার শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এর অন্যথায় আজ সারাবিশ্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছে তা নস্যাৎ করা সম্ভব হবে না।

‘হুসাইন (আ.)-এর মতো শোকাবহ শাহাদাত নেই’

২৩ ডিসেম্বর ২০১৩ ইমাম হোসাইন (আ.)-এর চেহলাম (আরবাইন) বার্ষিকী উপলক্ষে রেডিও তেহরানের সাথে সাক্ষাৎকার।

রেডিও তেহরান : কেন ইসলামের মহাপুরুষদের মধ্য থেকে তাঁদের জন্ম, ওফাত বা শাহাদতের বার্ষিকী পালন করা হলেও একমাত্র ইমাম হুসাইন (আ.)-এর জন্ম ও শাহাদাতের বার্ষিকী ছাড়াও তাঁর শাহাদাতের চেহলামও পালন করা হয়?

আবুল কাসেম : পবিত্র কোরআন ও বেশ কিছু হাদিস থেকে ইসলামে চল্লিশ সংখ্যাটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য বোঝা যায়। যেমন আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন : ‘এবং আমরা মূসাকে ত্রিশ রাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এবং সেগুলোকে আমরা (আরও) দশ রাত দ্বারা পূর্ণ করেছিলাম; এভাবে তার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতকাল চল্লিশ রাতে পূর্ণ হলো।’ (সূরা আরাফ : ১৪২)

মহানবী (সা.) বলেছেন :

مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا جَرَتْ يَنَابِيْعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ

‘যে কেউ চল্লিশ দিবা-রাত্রি আল্লাহর জন্য ইবাদত করে অর্থাৎ চল্লিশ দিন তার মধ্যে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে তবে আল্লাহপাক সে ব্যক্তির অন্তঃকরণ থেকে হেকমত ও জ্ঞানের এক ফল্গুধারা তার জিহ্বায় প্রবাহিত করেন।

কোনো কোনো হাদিসে এসেছে– 'যদি কোনো মৃতের জন্য চল্লিশজন মুমিন দোয়া করে তবে আল্লাহ তাদের দোয়ার বরকতে ঐ মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেন ।'

অপর একটি হাদিসে বলা হয়েছে : চল্লিশ বছর বয়সে মানুষের বুদ্ধি পরিপক্বতা লাভ করে ।'

সুতরাং ইসলামে চল্লিশের তাৎপর্যের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য একটি বিষয় ।

এখন আসি ইমাম হুসাইনের চেহলামের বিষয় । যেহেতু মানবজাতির ইতিহাসে তাঁর শাহাদাতের মতো শোকাবহ কোন শাহাদাত নেই । তাই এ শাহাদাতের ঘটনা সময়ের সীমাকে পেরিয়ে অমরত্বের বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। স্বয়ং ইমাম হাসান ইমাম হোসাইনকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :

لا يوم كيومک يا ابا عبد الله

'হে হুসাইন! তোমার শাহাদাতের দিনের মতো কোন (শোকাবহ) দিন নেই ।'

চেহলাম পালনের উদ্দেশ্য হলো ইমাম হুসাইনের শিক্ষাকে জাগরুক রাখা । আর যেহেতু ইমাম হুসাইনের বিপ্লবের মধ্যে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ ও সত্যপন্থী নেতাদের শাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন লুকিয়ে রয়েছে সেহেতু আমরা ইমাম হুসাইনকে যত বেশি স্মরণ করব ততবেশি ইসলামকে চিনতে পারব ও তা প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বুদ্ধ হব । এ কারণেই আমরা দেখি কুরআনে বার বার বিভিন্ন নবির জীবনী ও তাদের কর্ম সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার জন্য রাসূল (সা.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ।

'যিয়ারতে ওয়ারিস' নামে প্রসিদ্ধ যিয়ারতে ইমাম হুসাইনকে সকল নবীর ওয়ারিস বলা হয়েছে । সুতরাং তাঁর চেহলাম পালন ও তাঁর স্মরণের মধ্যে যেন সকল নবির স্মরণ নিহিত রয়েছে । ইসলাম টিকে থাকার অর্থ সব নবীর মর্যাদা রক্ষা । ইমাম হুসাইন তাঁর আন্দোলনের মাধ্যমে সব নবির মর্যাদাকে রক্ষা করেছেন । পুরাতন ও নতুন পুস্তকে নবীদের যেরকম মন্দভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে আপনারা তা লক্ষ্য করুন । রাসূল (সা.), হযরত মূসা (আ.), হযরত দাউদ (আ.) ও অন্যান্য নবি সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এমন কিছু অবমাননাকর বর্ণনা দেখতে পাই যেগুলো ইহুদিরা ইসলামের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে । বনি উমাইয়ার শাসনামলে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ বিকৃতি ঘটেছে । কারণ, তারা চেয়েছে নবিদের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে নিজেদের পর্যায়ে নামিয়ে এনে রাসূল (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত খলিফা হিসাবে

নিজেদের বৈধতাকে প্রমাণ করতে। ইমাম হুসাইন তাদের এ অপচেষ্টাকে প্রতিহত করেছেন। যদি ইমাম হুসাইন তাদের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়াতেন তবে ইসলামও আজ ইহুদী ও খ্রিস্টবাদের পরিণতি বরণ করতো। তাই প্রকৃতপক্ষে বলা যায়, ইমাম হুসাইন কারবালায় ইসলামকে রক্ষার মাধ্যমে সব নবির মর্যাদাকে রক্ষা করেছেন। এটিই তাঁর চেহলাম পালনের বিশেষত্ব।

রেডিও তেহরান : আরবাইন উপলক্ষে মুসলমানদের করণীয় কর্তব্য কী?

আবুল কাসেম : চেহলাম বার্ষিকী বা আরবাইন উপলক্ষে মুসলমানদের করণীয় কী? আরবাইন উপলক্ষে মুসলমানদের করণীয় নির্ণয় করতে আমাদের ইমাম হুসাইনের আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে হবে। যিয়ারতে আরবাইনে এ উদ্দেশ্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে : 'হে আল্লাহ! ইমাম হুসাইন তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছেন যাতে আপনার বান্দাদেরকে অজ্ঞতা এবং পথভ্রষ্টতা ও বিপথগামিতার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা থেকে মুক্তি দিতে পারেন।'

যে অজ্ঞতায় সেদিন মুসলিম উম্মাহ নিমজ্জিত ছিল তা হলো সত্য ইমামকে না চেনা এবং বাতিল শাসকের আনুগত্যকে মেনে নেয়া। চেহলাম পালন আমাদের এ শিক্ষা দেয় যে, আমাদেরকে বর্তমান সময়ের সত্যপন্থীদের চিনতে হবে। এরপর জামানার ইয়াযীদদের শনাক্ত করতে হবে যারা ইসলামের লেবাস পরে মুসলমানদের শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়ে মুসলিম উম্মাহর ক্ষতি সাধনে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর এ গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে উম্মাহকে সচেতন করে তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

রেডিও তেহরান : ইমাম হুসাইন (আ.)-এর পবিত্র মাজার যিয়ারতের ফজিলত এবং দূর থেকে তাঁর জন্য ও কারবালার শহীদদের জন্য যিয়ারত পাঠের তাৎপর্য বা ফজিলত কী?

আবুল কাসেম : ইমাম হুসাইন (আ.)-এর যিয়ারতের অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। আমি তা থেকে শুধু একটি হাদিস বর্ণনা করব। ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : 'তোমরা প্রতি বছর হুসাইন (আ.)-কে যিয়ারত কর। কারণ, যে তাঁর মর্যাদাকে সঠিকভাবে বুঝে (যেমনটি আল্লাহর রাসূল বলেছেন) তাঁর যিয়ারত করবে এবং তাঁর অনুসৃত পথের বিপরীত পথে না চলবে তবে তার জন্য আল্লাহ জান্নাত ছাড়া অন্য কোন বিনিময় রাখবেন না।'

দূর থেকে কারবালার শহীদদের যিয়ারত পাঠের উদ্দেশ্য হলো তাঁদের চিন্তাধারার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা এবং তাঁদের শত্রুদের চিন্তাধারা থেকে নিজেদের

বিচ্ছিন্নতার ঘোষণা দেয়া। কারণ, কারবালার শহীদদের উদ্দেশ্যে যে যিয়ারত পাঠ করা হয় তাতে বলা হয় : 'যারা আপনাদের সাথে সন্ধি করেছে, আমরাও তাদের সাথে সন্ধি করি এবং যারা আপনাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, আমরাও তাদের সাথে যুদ্ধ করি।' ঐতিহাসিকভাবে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব চলে আসছে, যিয়ারতকারী তার যিয়ারতের মাধ্যমে এ পথে সত্য কাফেলার সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সূরা নিসার ৮৫ নং আয়াতে বলেছেন : 'যে ব্যক্তি কোন সৎকর্মের সমর্থন দেবে, সে তার থেকে অংশ লাভ করবে আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ কর্মে সমর্থন দেবে, সেও তার থেকে অংশ পাবে।'

এ ঘোষণার মাধ্যমে যিয়ারত পাঠকারী তাঁদের মহান কর্মের ও সওয়াবের সাথে অংশীদার হয়।

রেডিও তেহরান : ইমাম হুসাইন (আ.)-এর বিপ্লব ও ইমাম মাহদী (আ.) সহ অন্য ইমামদের কর্মপদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আছে কি? যদি থেকে থাকে তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে, সব বিপ্লবের মধ্যে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর বিপ্লবই শ্রেষ্ঠ? বিশেষ করে ইমাম হাসান (আ.) ও ইমাম হুসাইন (আ.)-এর নীতিতেও কি কোনো তফাত আছে?

আবুল কাসেম : আহলে বাইতের পবিত্র ইমামদের কর্মপদ্ধতির মধ্যে তুলনা করতে হলে আমাদের রাসূল (সা.)-কে প্রেরণের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে হবে। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এ বিষয়টি বর্ণনা করে বলেছেন :

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ ۝٩

'তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্যধর্মসহ প্রেরণ করেছেন যাতে একে সমুদয় ধর্মের ওপর বিজয়ী করেন, যদিও অংশীবাদীরা তা অপছন্দ করে। (সূরা সাফ : ৯)

আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর মহান ইমামগণ এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তাঁদের কর্ম নির্ধারণ করেছেন। তাই যদিও ইমামদের কর্মপদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য ছিল, কিন্তু সেটি তার পরিবেশ ও পরিস্থিতির দাবিতেই ছিল, কখনই তা তাঁদের বৈশিষ্ট্যগত তফাত থেকে উদ্ভূত ছিল না যে, বলা যাবে, যদি ইয়াযীদের সময় ইমাম হাসান জীবিত থাকতেন তবে সন্ধির নীতি গ্রহণ করতেন। কখনই বিষয়টি এরূপ নয় যে, তিনি যুদ্ধ পছন্দ করতেন না বলে শান্তিপূর্ণ পথকে প্রাধান্য দিতেন।

কয়েকটি যুক্তিতে আমাদের এ দাবিটি সত্য। প্রথমত, মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন উভয়েই একরূপ ছিলেন এবং নীতির ক্ষেত্রেও তাঁদের মধ্যে অভিন্নতা ছিল। তাঁরা উভয়েই একদিকে অত্যন্ত সাহসী ও অন্যদিকে বীর যোদ্ধা ছিলেন। নাহজুল বালাগার ২০৭ নং খুতবায় হযরত আলীর বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, তিনি সিফফিনের যুদ্ধে ইমাম হাসানের দুঃসাহসিকতায় এতটা শঙ্কিত হন যে, স্বীয় সঙ্গীদের বলেন : 'হাসানকে এভাবে মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করা থেকে নিবৃত কর। আমি তাকে হারানোর আশঙ্কা করছি।' তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, মুআবিয়ার সাথে তিনি সঙ্গীদের অসহযোগিতার কারণে সন্ধি করতে বাধ্য হন, ভীরুতার কারণে নয়। ঐতিহাসিক মাসউদী তাঁর 'ইসবাতুল ওয়াসিয়া' গ্রন্থে ইমাম হাসানের যে বক্তব্যটি উল্লেখ করেছেন তাতে তিনি বলেছেন : 'আমি যদি উপযুক্ত সঙ্গী পেতাম তবে খেলাফত লাভের জন্য এমন বিপ্লব ও আন্দোলন করতাম যে কেউ তার নজির দেখেনি।'

দ্বিতীয়ত মুআবিয়ার বাহ্যিক ধার্মিকতার বিষয়টি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বৈধতাকে জনগণের সামনে স্পষ্ট করা বেশ কঠিন ছিল। একারণে আমরা দেখি, ইমাম হাসানের শাহাদাতের পর মুআবিয়া দশ বছর জীবিত থাকলেও ইমাম হুসাইন তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহ্বান জানাননি। এর বিপরীতে ইয়াযীদের সময় যেভাবে অধার্মিকতা প্রকাশ্য রূপ লাভ করেছিল ইমাম হাসানের জীবদ্দশায় এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে তিনিও বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ইমাম হুসাইনের মতো বিদ্রোহ করতেন।

ইমাম মাহদী (আ.)-এর বিপ্লবও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর আবির্ভাবের যুগে অধিকাংশ মানুষ চিন্তাগত পূর্ণতার এমন পর্যায়ে পৌঁছবে যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মধ্যেই যে তাদের ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে। আর তাই তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর আন্দোলনের সাথে যোগ দেবে। আর তাদের সহযোগিতা নিয়েই তিনি বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ ও ক্ষমতাশীল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন। তাঁর যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বিবেচনা করেই তিনি উপযুক্ত পরিকল্পনা হাতে নেবেন। সুতরাং নীতিগত দিক থেকে ইমামদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তবে পরিবেশ ও পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে তাঁদের কর্মপদ্ধতিতে ভিন্নতা রয়েছে।